The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 9 - 32
ISSN 2306-3920

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনায় দর্শক-পরিবেশনাকারীর সম্পর্কের স্বকীয়তা অন্বেষণ
একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ

ইউসুফ হাসান অর্ক*

[**সার-সংক্ষেপ** : বাংলাদেশের কতিপয় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা পুনর্বীক্ষণের মাধ্যমে সেখানে দর্শক-পরিবেশনাকারীর সম্পর্কের স্বকীয়তা পর্যবেক্ষণ বক্ষ্যমাণ গবেষণার প্রতিপাদ্য। এ পর্যায়ে যুগীর গান, চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবের পরিবেশনা ও যাত্রার শহরকেন্দ্রিক পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করে প্রতিপাদ্য বিষয়ে পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হযেছে। নাটোরের যুগীর গানের দুইটি পরিবেশনা, ঢাকাতে যাত্রা পালার দুইটি পরিবেশনা এবং মানিকগঞ্জে অনুষ্ঠিত চৈত্র সংক্রান্তির পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। এ সমস্ত পরিবেশনায় পরিপ্রেক্ষিতভেদে 'উপলক্ষ্য', 'দর্শক-সামাজিক'-এর ধারণা বিশ্লেষণ, প্রতিবেশ বিশ্লেষণ এবং উপস্থিত সকলের 'কালেকটিভ আনকনশাস' বিশ্লেষিত হয়েছে। পরিবেশনায় রস নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দর্শক হিসেবে সামাজিকগণ অংশগ্রহণ করে বলে তারা একটি প্রত্যক্ষ উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়। একটি সামষ্টিক বোধের উদযাপনে অংশগ্রহণের তৃপ্তি নিয়ে 'সামাজিকগণ' ঘরে ফেরে। 'উৎসব-উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক' এই পরিবেশনাগুলোতে পরিবেশনাকারীদের পৌরহিত্যমূলক অবস্থানকেও প্রবন্ধকার সনাক্ত করেছেন পূর্ববর্তী গবেষণার মতোই। তাই ঐতিহ্যবাহী এই পরিবেশাগুলোর ক্ষেত্রে পূর্বের গবেষণায় উল্লেখিত 'আনুষ্ঠানিক ও সামষ্টিক উদযাপন' বিষয়টি বিবেচনা করে এ ধরনের পরিবেশনার স্বকীয়তা এমনভাবে অনুধাবন করা গেছে যাকে নাট্যমূলক হলেও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের 'নাট্য' পরিভাষা দিয়ে বিচার করা সমীচীন নয়। একে 'সামাজিক পার্বণ' হিসেবে বিবেচনা করাই যৌক্তিক। তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণ করার গবেষণার ক্ষেত্রে এক ধাপ এ সংশয়কে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া বলে বিবেচনা করা চলে।]

পুনর্বীক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোতে অনুসৃত নানা অনুঘটক, উপাদান ইত্যাদি কী করে দর্শক-পরিবেকশনাকারীর সম্পর্ককে একটি স্বকীয় রূপ দেয় তার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োগভিত্তিক অন্বেষণ-অভিপ্রায় থেকে বক্ষ্যমাণ গবেষণার অবতারণা। এ বিষয়ক গবেষণার প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়ে প্রবন্ধ আকারে মুদ্রিত হয়েছে (অর্ক, ২০১৮: ৬৬)। কাজেই এক্ষণে বাংলাদেশের আরো কতিপয় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সেখানে 'দর্শক-পরিবেশনাকারীর সম্পর্কের স্বকীয়তা' বিষয়টির দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। স্পষ্ট করে বললে দর্শক-পরিবেশনাকারীর সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যটি পরিবেশনাগুলোর স্বকীয়তা নিরূপণে কোনো ভূমিকা রাখে কিনা তার পর্যবেক্ষণও পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে শুরু করে এ পর্যায়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হিসেবে বিবেচিত।

---

* **ড. এ কে এম ইউসুফ হাসান** : অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, **ই-মেইল** : arkoritu@juniv.edu

প্রাথমিক গবেষণায় গাজীর গান, মনসার গান, পদ্মপুরাণ গান, কান্দনী বিষহরির গান, পদ্মার নাচন, কিসসা গান ইত্যাদি পরিবেশনাগুলোতে পরিবেশনার নিরাভরণতা ও বর্ণনাময়তার নানা দৃষ্টান্ত সাপেক্ষে দর্শক-পরিবেশনাকারীর আন্তঃযোগাযোগ বিশেষ ধরণের বলে প্রত্যক্ষণ করা গেছে। এ পর্যায়ে যুগীর গান, কাঁচখেলা, যাত্রার শহরকেন্দ্রিক পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করে প্রতিপাদ্য বিষয়ে পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। নাটোরের যুগীর গানের দুইটি পরিবেশনা, ঢাকাতে যাত্রা পালার দুইটি পরিবেশনা এবং মানিকগঞ্জের চৈত্র উৎসবে অনুষ্ঠিত কাঁচখেলার পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। এ সমস্ত পরিবেশনায় পরিপ্রেক্ষিতভেদে 'উপলক্ষ্য', 'দর্শক-সামাজিক'-এর ধারণা বিশ্লেষণ, প্রতিবেশ বিশ্লেষণ এবং উপস্থিত লোকসকলের (পরিবেশনাকারী-দর্শক উভয় পক্ষ অর্থে) সামষ্টিক চেতনার ক্রিয়াশলিতা ইত্যাদি আপাতভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ইয়ুং বিশ্লেষিত 'কালেকটিভ আনকনশাস' (Jung, 1968: 3) এর সর্বজননীন ধারণার সাথে জনপদ-সংশ্লিষ্ট 'সামষ্টিক চেতনা'-র সম্পর্কও বিশ্লেষিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে। গবেষণার বিশ্লেষণ পর্যায়ে এই বিষয়গুলো প্রতিপাদ্য হয়ে পরিবেশনা ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুধাবনে সহায়তা করেছে।

যুগীর গান

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল প্রধাণত রাজশাহী, নাটোর ও রংপুর অঞ্চলে সাধারণত গ্রামীণ সমাজে বিনোদনের জন্য কোনো ধর্মীয় কৃত্য বা রাষ্ট্রীয় উপলক্ষ্য ছাড়াই যুগীর গান নামক পরিবেশনাটি অনুষ্ঠিত হয়। যুগীর গানের পরিবেশনা নিজেই একটি উপলক্ষ্য হয়ে গ্রামে গ্রামে পরিবেশিত হয়ে আসছে বলে জানা গেছে (হক, মেহেদি, ২০২৪: সাক্ষাৎকার)। গায়েনদের কথাবার্তা অনুসারে আঞ্চলিকভাবে একে 'যুগী পর্ব গান' বলেও ডাকা হয়। বক্ষ্যমাণ গবেষণার ফিল্ডওয়ার্ক হিসেবে নাটোরের দস্তানাবাদ সবুজ সংঘ নামে একটি দলের পরিবেশনা প্রত্যক্ষণ করা গেছে। পরিবেশনার স্থান ছিলো নাটোর সদর উপজেলার কাফুরিয়া ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামে। পরিবেশনার তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪। কোন বাড়ীর উঠানের মধ্যভাগে বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারেরা উপবেশন করা অবস্থায় গীত ও বাদ্য পরিবেশন করেন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে মূল গায়েন (যুগী) ও সহযোগি (ভুট্টু) বৃত্তাকার চলনে ঘুরে ঘুরে পরিবেশনা করে থাকেন। খানিকটা গীত, কথোপকথন আবার গীত এই ক্রমানুসারেই পরিবেশনাটি সম্পন্ন হয়। দর্শক চারিদিকে ঘিরে বসে বা দাঁড়িয়ে পরিবেশনাটি উপভোগ করেন। যুগীর হাতে একটি মশাল থাকে এবং তিনি মুখমণ্ডলে তিলক ইত্যাদি রূপসজ্জাসহ যুগীর বেশে আবির্ভূত হন।

চৈত্র উৎসবের কাঁচখেলা/মুখা কাঁচ

চৈত্রউৎসবে (স্থানীয়ভাবে 'চৈত্রৎসুব') চৈত্র মাসের শেষ ১০ দিনজুড়ে কয়েকদিন-রাত-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে চড়ক পূজা বা শিবের গাঁজন, মুখা খেলা, কালী কাঁচ ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। এই উৎসব মূলত কৃষি দেবতা শিবের লৌকিক আচারকে অনুকরণ বা অনুসরণ করে সম্পাদিত এক ধরণের লোক বিনোদন এবং একাধারে কৃত্যাচার। লোক পরম্পরায় বিশ্বাসজনিত এবং স্বতস্ফূর্ত চর্চায় আবহমান কাল থেকে পরিবাহিত এ অনুষ্ঠান কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের কৃষ্টি হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। আপাতদৃষ্টে মনে হয় এই অনুষ্ঠান কৃত্যের এক কঠিন পরিক্রমা। দেবতা অধিষ্ঠান হওয়ার পর কয়েকদিন ধরে সারাদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাগনের বাজনা ও নৃত্য পরিবেশন করে গ্রামীণ কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের অনেকেই। জানা গেছে মানিকগঞ্জে এদেরকে সন্ন্যাসী বলা হয়। অর্থাৎ মাগন, বাদ্য বাজন ও নৃত্য ইত্যাদিতে যারা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে সন্ন্যাসী নামে ডাকা হয় এবং তারা সন্ন্যাসব্রত হিসেবে নির্দিষ্ট সেই কয়েকদিন ধাতব বা কাষ্ঠ নির্মিত বিছানায় ঘুমাননা। এছাড়াও স্ত্রী সহবাস থেকে তারা বিরত থাকেন, আহারাদিও নির্দিষ্ট থাকে। তাঁরা লাল কাপড় পরিধান করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাগনের চাল, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহের সময় নৃত্য করে থাকেন (চিত্র)। ফিল্ডওয়ার্কে লক্ষ করা গেছে বেশিরভাগ বাড়ির উঠানে আল্পনা করা রয়েছে। সেখানে কৃত্যের নানা অর্ঘ্য দেয়া থাকে এবং সেগুলোকে প্রদক্ষিণ করেই সন্ন্যাসীগণ নৃত্য করেন। এদের নানা চরিত্রের বেশ। যেমন শিব, অসুর, দূর্গা, কালী, ডাকিনী-যোগিনী, পার্বতী-গৌরী ইত্যাদি। গৃহস্থগণ নৃত্যরত সন্ন্যাসীদের প্রথমে পা ধুইয়ে

দেন, তারপর সরবত মিষ্টি ইত্যাদি খাইয়ে দেন। এক বাড়িতে মাগন নৃত্য শেষ হয়ে গেলে তারা পরবর্তী বাড়িতে নৃত্য করার জন্য প্রস্থান করেন। এভাবে চৈত্র সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় সকলে মিলে ভক্তির প্রসাদ হিসেবে আহার গ্রহণ এবং তারপর সামষ্টিকের উপস্থিতিতে নৃত্য ও নাট্যমূলক নানা পরিবেশনা হয়। এই হলো সাধারণ অর্থে চৈত্র উৎসব ও কাঁচখেলা। কালীকাঁচ এর একটি অংশ। এখানে পরিবেশনাকারী স্থানীয় জনগণ এবং দর্শকও সংশ্লিষ্ট গ্রামের লোকসমাজ। বাদ্য হিসেবে ঢাক, কাঁসা, শঙ্খ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নির্দিষ্ট মূল সন্ন্যাসী সকল বালাইগণদের সুর, ছন্দ ও আচারে বেঁধে ফেলেন। কয়েকটি পরিক্রমা পার করে লোকাচার, সুর ও কর্ষণে নতুন বীজ ও শস্যের আগমন জানায় তারা বাদ্যে ও নৃত্যের তালে তালে। এর ব্যাপ্তি বৃহৎ। পরিবেশনারীতিতে এক নজরে লক্ষ করা যায় লোকবিশ্বাসে ও মানতে ভূমি পূজা বা শস্যদেবতার বন্দনা। চৈত্রের অন্তে নাট্য ও কৃষিতে একাকার কৃষি সমাজে বৈশাখের আগমন হয়ে ওঠে সার্বজনীন এক উদ্‌যাপন। এ পর্যায়ে মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানাস্থ বিনোদপুর গ্রামের ঋষিপাড়ায় চৈত্র উৎসবে উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট কৃত্যাদি এবং সেখানে দর্শক-সামাজিকগণের অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা গেছে ১২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে।

যাত্রা

যাত্রা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যমূলক পরিবেশনা হিসেবে সর্বজনবিদিত। মধ্যযুগের কৃষ্ণলীলা বা লীলানাট্য থেকে এর উদ্ভব বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। সমকালীন যাত্রায় অবশ্য যুগচিহ্ন ও বিষয়বস্তুভেদে নানা শ্রেণির পরিবেশনা লক্ষ করা যায়। চৌকোণ উঁচু খোলা মঞ্চ, উচ্চকিত সুরে বাঁধা চরিত্রাভিনয়, বিবেক নামক একটি স্বকীয় ভূমিকা/চরিত্রের স্বকীয় প্রয়োগ, সংগীত এবং চারদিকে দর্শকের সমাবেশ ইত্যাদি যাত্রার সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার মঞ্চে অনুষ্ঠিত যাত্রা নিবন্ধনের জন্য পরিবেশিত দুইটি পালা প্রত্যক্ষ করে এতদ্বিষয়ক বিশ্লেষণ সম্পাদিত হবে।

এ পর্যায়ে ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে লক্ষ্মীরের সুবচন যাত্রা সমাজ প্রযোজিত 'চরিত্রহীন' এবং যশোরের যশোর যাত্রা ইউনিট প্রযোজিত 'মমতাময়ী মা' নামে দুটি সামাজিক যাত্রার পরিবেশনা প্রত্যক্ষণ করা হয়েছে। দুটো পরিবেশনাতেই যাত্রার নাট্যকৃত্যাদি যেমন দেশ বন্দনা, সবশেষে জাতীয় সংগীত, অর্কেস্ট্রা বাদন এবং উচ্চকিত স্টাইলাইজড চরিত্রাভিনয় লক্ষ করা গেছে। উভয় পরিবেশনাতেই প্রম্পটার এবং বিবেক চরিত্রের প্রবেশ যথারীতি দেখা যায়। বিবেক দৃশ্যের নাটকীয় মুহূর্তে প্রবেশ করে যথারীতি নীতিকতত্ত্ব-সর্বস্ব গীত পরিবেশন করেন ঘুরে ঘুরে। অভিনেতাদের সংলাপ প্রক্ষেপণে বিশেষ এক ধরণের আরোহণ এবং কণ্ঠে গীত প্রয়োগও ঐতিহ্যহ্যিক রীতি হিসেবে পরিবেশনা দুটোতে প্রযুক্ত ছিলো। এ পর্যায়ের পরিবেশনায় সামাজিক যাত্রা হিসেবে বাস্তবধর্মী ধারার পোষাক ও মঞ্চোপকরণের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। তবে যাত্রার খোলা মঞ্চ, নিরাভরণ মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি যাত্রার ঐতিহ্য হিসেবে অনুসৃত ছিলো।

আয়োজক, দর্শক ও পরিবেশনাকারী

উপরে উল্লেখিত পরিবেশনাগুলোতে আয়োজক, দর্শক এবং পরিবেশনাকারীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। যুগীর গান এবং চৈত্র উৎসবে দর্শক বলতে সংশ্লিষ্ট গ্রামের গ্রামবাসীদেরই প্রত্যক্ষ করা গেছে। সাধারণত কোন গ্রামের অবস্থাপন্নের বাড়িতে এসমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন। যেমন যুগীর গানের ২০২৪ সালের ৩০ জানুয়ারির পরিবেশনাটি আয়োজিত হয়েছিলো প্রবন্ধকারের অর্থায়নে সেই গ্রামের অধিবাসী ব্র্যাক কর্মকর্তা শেখ মো. মেহেদী হাসান (৪৩)এর সহোদর শেখ হেলাল-এর বাড়ির উঠানে। আশেপাশের গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই সেই পরিবেশনা দেখতে সমবেত হয়েছিলেন বলে প্রত্যক্ষ করা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুগীর গানের আরেকটি পরিবেশনা ২০২১ সালের ২৯ জানুয়ারি আয়োজন করা হয়েছিলো নাটোর শহরেই, স্থানীয় লোকশিল্পী কার্তিক বাউলের আঙ্গিনায়। সেখানকার দর্শকদের মধ্যেও আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিলো। ২০২৪ সালের ১২

এপ্রিল তারিখের চৈত্র উৎসবে কাঁচখেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঋষিপাড়ার ননী গোপালের আঙ্গিনায়। জানা যায় তিনি মৃত কিন্তু বেশ কয়েক পূরুষ ধরে তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন এই পরিবার। তার সন্তানদ্বয় ইউরোপে চাকুরিরত (দাস, ২০২৪: সাক্ষাৎকার) এবং ঘরবাড়ির কাঠামো প্রত্যক্ষণেও মনে হয় অন্তত অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পরিবারটি সেই গ্রামে তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন। সেই বাড়ির উঠানে সামিয়ানা টাঙিয়ে পরিবেশনার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছিলো। এমনকি মাগনের চাউলে যে রান্না বান্না তাও সেই বাড়িতেই সম্পন্ন হয়েছিলো। আয়নাল হক (যুগীর গানের গায়েন), শেখ মেহেদী এবং পরিবেশনায় উপস্থিত আরও কয়েকজনের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, সবুজ সংঘ ক্লাব সেই নামে স্থানীয় নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে থাকে যার মূল দায়িত্বে থাকেন শেক মেহেদীসহ তাঁর পরিবার ও বন্ধু-স্বজন। যুগীর দলের নামকরণ করেছেন দস্তানাবাদ সবুজ সংঘ যুগীর দল।

নাটোরের কার্তিক বাউলের ঘর-দোর, শেখ মেহেদীর বাড়ীর অবস্থা ও আপ্যায়ন ইত্যাদি অভিজ্ঞতা থেকেও এ উদ্যাক্তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য ও সংস্কৃতি সচেতনতা অনুধাবন করা গেছে। সেক্ষেত্রে ননী গোপালের পরিবার, কার্তিক বাউল কিংবা মেহেদীর মতো উদ্যোক্তাদের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাসমূহের আয়োজক হিসেবে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সনাক্ত করা চলে। যাত্রা বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে বর্তমানে পেশাদার দল পরিবেশনা করে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ দলগুলোর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করে থাকে। বেশ কিছু বছর আগে পর্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষও নানা উপলক্ষ্যে যাত্রা আয়োজন করে নিজেরাই সেখানে সৌখিন যাত্রাতে অভিনয় করতো বলে জানা যায়। আজকাল এর প্রচলন কমে গেছে। এ পর্যায়ে গত ১৮-২৫ মার্চ ২০২৪-এ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত যাত্রা উৎসবে দুটো যাত্রা পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। পরিবেশনাতে পেশাদার অভিনেতারাই অভিনয় করেন। তাই, লোক সমাজের মধ্যে প্রচলিত পরিবেশনা আঙ্গিক হলেও যাত্রার জনপ্রিয়তা, পেশাদারীত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় বলা যায় এ পর্যায়ে শহরের যাত্রা পরিবেশনায় আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছে রাষ্ট্র বা কোনো প্রতিষ্ঠান। তবে এই পৃষ্ঠপোষকতা পরিবেশনার আয়োজন, রেজিস্ট্রেশনের বাইরে গিয়ে এ শিল্পের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ক্রিয়াশীল কি না সে ব্যাপারে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। কাজেই বলা যায়, ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনারগুলোর আয়োজক বা পৃষ্ঠপোষক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিকভাবে অবস্থাসম্পন্ন এই শ্রেণিটিকে যতীন সরকার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে 'কৃষি-বহির্ভূত অন্য বৃত্তিধারী, অথবা বৃহৎ জোত বা কৃষিক্ষেত্রের মালিক' (সরকার, ২০১৬: ৮১) হিসেবে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক নিয়ন্তা হয়ে উঠেছেন এই শ্রেণীর গ্রামনিবাসী কিছু মানুষ। এর ফলাফল হিসেবে তারা সমাজনিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উঠেছেন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। যতীন সরকারের ভাষায়:

> অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণসূত্রে সমাজনিয়ন্তার ভূমিকাতেও এদেরই অধিষ্ঠান। এদের প্রতাপের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসাধারণকেই নতশির হয়ে থাকতে হয়। সাধারণের ভেতরকার যে-সব 'লোক' আগে সামান্য পরিমাণে হলেও ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব ভোগ করতো, এখন তারা প্রায় সবাই ভূমিহীন হয়ে গ্রামীণ সর্বহারায় পরিণত (সরকার, ২০১৬: ৮১)।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপরোক্ত মতামতটির সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে বলা যায়, সেই অর্থে গ্রামীণ এই অবস্থাসম্পন্ন শ্রেণিটি সংস্কৃতির নিয়ন্তা হিসেবেও স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত বলেই মনে হয়। মেহেদী, কার্ত্তিক বাউল সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সমীহ, মন্তব্য ইত্যাদি প্রত্যক্ষণ থেকেও উপরোক্ত বিবেচনার যুক্তি মেলে। নিজ জনপদ ও ভূমি থেকে উৎসারিত সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এই অবস্থাসম্পন্ন শ্রেণিটির অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে তাই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার অবকাশ পাওয়া যায়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, কৃষি-নির্ভর গ্রামের ভূমিহীন কৃষক বা অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল লোকসাধারণের বিনোদনের জন্য ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা কেবলই সেই শ্রেণীর আয়োজকদের সংস্কৃতি-সচেতনতা হিসেবে বিবেচনা করাটা সঙ্গত হয়না। এভাবে বিবেচনা করলে পুঁজিবাদী বর্তমান বিশ্বের প্রভাবে

> উন্নোয়নুখ একটি জনপদ ও সমাজের একটি সাধারণ মাত্রাই উন্মোচিত হয়। বরং এভাবে ভাবার অবকাশ রয়েছে যে এই আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা শর্তহীন নয়, কৃষিজমিতে কাজে লাগানো ছাড়াও কোনো না কোনো প্রয়োজনে এই বিত্তহীন কৃষি-মজুর শ্রেণীকে উচ্চবিত্তের প্রয়োজন পড়েই। শ্রেণী চৈতন্য থেকে দেখলে তাই এই পরিবেশনার আয়োজন বা আপাত পৃষ্ঠপোষকতাকে বঞ্চিতের ক্রোধ প্রশমন করার একটি উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করারও অবকাশ থাকে বৈকি। তবে কার্ত্তিক বাউলের মতো লোকশিল্পী ও একাধারে পৃষ্ঠপোষক আয়োজকদের বিবেচনা করলে এই বাংলাদেশে সংস্কৃতি-সচেতন উচ্চবিত্তের অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হয়।

পরিবেশনার 'দর্শক' হিসেবে যারা আসরস্থলে উপস্থিত হন সাধারণভাবে তাদের বেশিরভাগই স্থানীয় গ্রামবাসী। বাংলাদেশ শিল্পে উন্নয়নের প্রচেষ্টারত হলেও এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ গ্রামভিত্তিক কৃষিপ্রধান দেশ। বলা যায় কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের লোকসমাজের প্রাত্যহিকতাতে তাই স্বাভাবিকভাবেই কৃষি, ভূমি, ঋতুচক্র, সামষ্টিক বিশ্বাস, জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কিত দ্রব্যাদি, সমকালীন বাজারের নানা অনুসঙ্গ ইত্যাদি প্রতিফলিত। ফিল্ডওয়ার্কে লক্ষ্য করা গেছে উপস্থিত 'দর্শক'-গণের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষিকাজ, দিনমজুর কিংবা কৃষির সাথে সম্পর্কিত নানা পেশায় জড়িত। চৈত্র সংক্রান্তির কাঁচখেলার উৎসবে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে প্রবাস ফেরত কৃষিজীবি, ইলেক্ট্রিশিয়ান, বাদাম বিক্রেতা, শিক্ষক, হাজাম (গ্রামবাসীর ভাষায় "পোলাপানের মুসলমানি করানোর পেশা"), বাঁশের জিনিসপত্র বানানোর কারিগর, কারুশিল্পী, মুদি দোকানদারসহ নানা পেশার লোকসকল উপস্থিত ছিলেন। যুগীর গানের পরিবেশনাতেও একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা গেছে। বলা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপস্থিত দর্শকই স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষ বা 'লোক'। এদের মধ্যে নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাতেও ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে প্রায় সকল পর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের 'দর্শক' হিসেবে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে বলে গবেষক বিভিন্ন ফিল্ডওয়ার্কে প্রত্যক্ষ করেছেন।

গ্রামবাসীদের সাথে প্রত্যক্ষ আলাপচারিতা এবং questionnaire ভিত্তিক উপাত্ত যে কয়েকটি বিষয় আলোকিত করেছে তার মধ্যে জনপদের প্রাত্যহিকতা, সামষ্টি বিশ্বাস, আন্তঃসম্প্রদায় সম্পর্ক, অর্থনৈতিক পর্যায়, সামাজিক উৎসব-পার্বণাদির চর্চার ঐতিহ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য যোগাড়ের প্রয়োজনে যে questionnaire তৈরি করা হয়েছিলো এর পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে নমুনাটি প্রথমে নিচে দেওয়া হলো:

Questionnaire এর নমুনা

১। নামঃ

২। বয়সঃ

৩। পেশাঃ

৪। এই অঞ্চলে কী কী হয়?

৫। আপনি দেখতে আসেন? কেন আসেন?

৬। আপনি যে ধর্মে বিশ্বাসী, তার সাথে এগুলো মিলে? যদি না মিলে তাহলে কেন আসেন?

৮। অনুষ্ঠান যখন হয়, কেমন লাগে?

৯। কোন কোন উপলক্ষ্যে হয়?

১০। কারা আয়োজন করে?

১১। যারা পরিবেশনা করে, তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

উপরোক্ত questionnaire ছাড়াও পরিবেশনায় উপস্থিত লোকসকলের সাথে তাৎক্ষণিক আলোচনায় জানা যায় যে, ধর্মীয় কৃত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবেশনা হলেতো বটেই, গ্রামবাসী 'আয়োজক-দর্শকের' নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত না হলেও কখনও কখনও কেবল আনন্দের জন্য তারা এই পরিবেশনাগুলোতে উপস্থিত হন কিংবা আয়োজনে অংশ নেন। বহু বছর আগে থেকেই এই চর্চা সংশ্লিষ্ট গ্রামে রয়েছে বলে তারা জানান। কাজেই, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এ পরিবেশনার উপস্থিতি থেকে মনে করা যায় যে, আবহমান কাল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা এক অর্থে উদার একটি লোকসমাজে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলো অনুষ্ঠিত ও আদৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের অধিবাসী হিসেবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে অসুবিধা নেই যে এখনও এ সম্প্রীতি একটি পর্যায় পর্যন্ত থাকতে দেখা যায়। বক্ষ্যমাণ গবেষণার ফিল্ডওয়ার্কে পরিবেশিত কাঁচখেলা ও যুগীর গানে উপস্থিত লোকজনকে দেখে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে। তবে দর্শকদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন এই অবাধ অংশগ্রহণ আগে আরো বেশি ছিলো। তার মানে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তন কতোটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলাফল তা ভিন্ন গবেষণার সুযোগ দেয়। তবে এ পর্যায়ে এটুকু অনুধাবন করা গেছে যে, এখনও গ্রামীণ লোকসমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব। অন্তত এ ধরণের পরিবেশনাগুলোতে তো বটেই। সাধারণ মানুষের এই উপস্থিতি তাদের প্রতিবেশী হিসেবে কর্তব্য বলেই তাদের কথাবার্তায় বোঝা গেছে। আবার সামষ্টিক জীবন এবং যুথবদ্ধ সমাজের সামষ্টিক বিশ্বাসের সুতোয় গাঁথা প্রাত্যহিক জীবন বলেই হয়তো তারা এই শরীক হওয়াটাকে অস্বীকার করতে পারেনা। সামাজিক অনুষ্ঠানে অবাধে অংশগ্রহণকে যেকোনো জনপদের ক্ষেত্রেই আবহমানকালের চর্চা। তাই যদি হয়, উপস্থিত এই লোকসকলকে শিল্পের ভোক্তা অর্থে 'দর্শক' হিসেবে অনুধাবন করলে এদের স্বকীয় চরিত্রটি পুরোপুরি প্রকাশ পায় বলে মনে হয়না।

সত্যিকার অর্থে 'দর্শক' ধারণাটি কী? শিল্পের ভোক্তা হিসেবে যদি ধরি, পুঁজিবাদী বর্তমান পৃথিবীর অন্তত নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতিচর্চায় লক্ষ্য করা যায় যে, আহার-বাসস্থানের মতোই অর্থ তথা বিনিময়মূল্যের দ্বারাই স্বাচ্ছন্দ্য-প্রয়োজন কিংবা বিনোদন ইত্যাদি বিক্রয় হয় সেখানে। কনসার্ট, সিনেমা, লাইট এন্ড সাউন্ড শো, কনসার্ট কিংবা ইকো ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও এ প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে। এখানে নাগরিক মানুষ অর্থের বিনিময়ে নিজস্ব রুচি ও বোধ অনুসারে পণ্য যেমন কেনে তেমনি বিনোদনও (বিনোদনও এক অর্থে পণ্যে পরিণত)। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে টিকিটের বিনিময়ে যখন সেই নাগরিক মানুষটি হাতে একটি ব্রোশিওর বা স্মরণিকা নিয়ে সাধারণত প্রসেনিয়াম মঞ্চে প্রবেশ করে তখন তার মানসিক অবস্থা অনেকটা বিনোদন-পিয়াসী ক্রেতার। এদেরকেই সাধারণত অর্থে আমরা 'দর্শক' বলি। পরিবেশনাকারীর জীবনবোধ, জীবন-জীবিকা ইত্যাদির সাথে এই দর্শকের কোনো সরাসরি সম্পর্ক আপাত অর্থে নেই। তাই সেই খোঁজ এই দর্শকের নেই, প্রয়োজনও নেই তাদের। অর্থের বিনিময়ে বিনোদানাদি ক্রয় করে অর্থেই অংশুমান ভৌমিক সম্ভবত এদেরকে 'উপভোক্তা' হিসেবে সনাক্ত করেন (ভৌমিক, ২০১৯: ১৮৯-৯০)। তবে 'উপভোক্তা' বলে যে আপাত নাগরিক দর্শকদের তিনি নির্দেশ করেছেন তা আলোচনার অবকাশ দেয় বৈকি। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নগরায়নের যে প্রবণতা তা বাংলাদেশে এখনো হয়েছে বলে সাধারণভাবে মেনে নেয়া মুশকিল। 'ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' বা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ইত্যাদি শ্লোগান নিয়ে উন্নয়নের যে ধারণা এ দেশে চর্চিত হচ্ছে তা অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যের বিচারে আপাত অর্থে আমাদেরকে 'নাগরিক' হিসেবে অভিহিত করলেও সত্যিকার নগরায়ন বাংলাদেশে এখনও হয়নি। বাংলাদেশের প্রায় নব্বইভাগ মানুষের শেকড় এখনও গ্রামে। এদেশ এখনো গ্রামপ্রধান। অন্তত দুই ঈদে ফাঁকা ঢাকা শহর দেখলে এ কথার সাথে দ্বিমত করার সুযোগ কম। তাই শহরে বসবাসরত আপাত নাগরিক দর্শকদের গ্রামীণ জনপদের স্মৃতিকাতর 'গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু লোকসকল' বলে প্রতিভাত হয়। গ্রামীণ জনপদে রাস্তাঘাট আর বিদ্যুতের প্রাপ্তি ঘটলেও সংস্কার ও লোকবিশ্বাস সেখানে উন্নয়নের চেয়ে বেশি প্রতাপশালী। সেই যুক্তিতে এই গ্রামে-শেকড়-থাকা মানুষগুলো শহরের টিকিটধারী দর্শক হলেও নাগরিক মঞ্চে তারা যুক্ত ও একাধারে নিমজ্জিত হয় গ্রামীণ স্মৃতি রোমন্থন করার অবচেতনে অভিপ্রায় নিয়ে। কিংবাএমত ব্যাখ্যা করাও চলে যে, নাগরিক পরিবেশনায় তারা স্মৃতি-

কাতরতার স্রোতে নিজের মাটির স্বকীয়তাকে মন্থন করেন। এঁরা জীবিকার জন্য দৌড়ালেও পুঁজিবাদী বিশ্বের সকল প্রবণতা তাদের জীবনবোধকে এখনও পুরোপুরি আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাই পাশ্চাত্যের অন্যান্য উন্নত দেশের নাগরিকদের সাথে তুলনা করে এদেরকে 'উপভোক্তা' নামে অভিহিত করার সাথে মতানৈক্য প্রকাশ করে গবেষক। বরং বলা যায়, জীবিকার প্রয়োজনে ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো বড়ো শহরে বসবাসরত বিভিন্ন জেলার মানুষ এই মহানগরগুলোতে এসে নিজেদের মতো একটি কমিউনিটি তৈরি করেন। ঢাকা শহরের বাসিন্দা হিসেবে গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে, এর নানা অংশে জেলা ভিত্তিক বা পেশাভিত্তিক লোকের আধিক্য রয়েছে। যেমন, জিগাতলা এলাকাতে দক্ষিনবঙ্গ বিশেষত বরিশাল অঞ্চলের পেশাদার গাড়িচালকদের সহজেই চোখে পড়ে। মতিঝিল সবুজবাগ-বাসাবো থেকে শুরু করে শনির আখড়া বা মাতুয়াইল এলাকায় কুমিল্লা থেকে আগত মানুষের আধিক্যও সাধারণভাবে লক্ষ করা যায়। এরা নিজেদের মতো একটি কমিউনিটি এমনভাবে নির্মাণ করেন যেন তা বরিশাল বা কুমিল্লা জেলার ক্ষুদ্র একটি অংশে পরিণত হয়। সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি "আপনার দেশের বাড়ি কোথায়"? যেন কুমিল্লা কিংবা বরিশাল বাংলাদেশের মধ্যেই একেকটি দেশ। 'মাইনোরিটি কমপ্লেক্স' থেকেই হয়তো এই ধরনের সামষ্টিক বোধ-প্রসূত বাক্যগুলোর চর্চা হয়ে থাকে। হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানী তাকাদা মিনেও-ও এদের 'দেশ' ধারণাটি নিয়ে সনাক্ত করেছেন তাঁর গ্রন্থে (মিনেও, ২০০৬: ৫০২ অনুসারে)। সেখানে জেলা ভিত্তিক দেশচেতনা যেমন তাদের বসবাসের সাথে সম্পর্কিত তেমনি নগরকেন্দ্রিক বিনোদন অভিজ্ঞতা গ্রহণের ক্ষেত্রেও তা প্রভাব ফেলে বলে মনে করা যৌক্তিক। দেখা যায় লোককাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রগুলো বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়। সেখানে কাহিনি ও বিষয়বস্তুর সাথে স্বীয় জীবনবোধের সম্পর্ক, লোকসুর, পরিচিত চরিত্র ও স্বীয় প্রাত্যহিকতা-সংশ্লিষ্ট অভিক্রিয়া ইত্যাদি এদেরকে ফেলে আসা দেশের কথা মনে করিয়ে দেয় এমত ভাবাও অবান্তর নয়। নগরকেন্দ্রিক থিয়েটারের দর্শকও গ্রাম থেকে শহরে এসে বসবাস করা এই সংখ্যা লঘু কমিউনিটিই। তাই প্রায় সমান্তরাল দেশচেতনা-ভূমিচেতনা বাংলাদেশের 'আপাত নাগরিক' দর্শকের মধ্যে এখনও ক্রিয়াশীল বলে সনাক্ত করা সম্ভব। বাঁশির মেঠো সুর, পরিচিত গল্প কিংবা ভাটিয়ালি গান যখন নাট্যে প্রযুক্ত হয় তখন এই তথাকথিত নাগরিক দর্শকের চোখ ভিজে ওঠে। পালা বা ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর প্রেরণাসম্ভূত থিয়েটারে বন্দনা, গানে গানে সংলাপ বা নিরাভরণ মঞ্চ তাদের গ্রামীণ আন্তরিক আসরের স্মৃতিকে জাগ্রত করে, নাট্য প্রযোজনার উপরোক্ত উদ্ভাস-অনুসঙ্গসমূহ তখন শেকড়ে ফেরার হাহাকার হয়ে তাদেরকে একইভাবে আন্দোলিত করে এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। কাজেই পরিবেশনা কতোখানি নাট্যমূলক হলো তার চেয়ে এই সমস্ত ফিউশনভিত্তিক নগরকেন্দ্রিক নাট্য-প্রযোজনাগুলোতে অনুসৃত মৃত্তিকা-লগ্ন দ্যোতনাই দর্শককে তৃপ্ত করে। যদিও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ তৃপ্তি শেষ পর্যন্ত বিনিময়মূল্যের দ্বারা ক্রয়কৃত বলে দর্শক সেখানে নাগরিক মঞ্চের নানা রীতি-নীতি দ্বারা 'ভদ্রস্থ' কিন্তু সত্যিকার অর্থে নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবেই রয়ে যায়। মনে হয় পরিবেশনাকারীর সাথে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, দ্বায় বা সুযোগও নেই সম্পর্ক স্থাপনের। কিন্তু নানা শ্রেণীর 'দর্শক' অর্থের বিনিময়ে মিলনায়তনে প্রবেশ করে বলে দর্শকদের রুচির খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন হয় পরিবেশনাকারীর(অভিনেতার)। কারণ নৈপূণ্য দিয়ে 'দর্শককে' তুষ্ট করার দ্বায় তার আছে। বিনিময়মূল্য যেহেতু রয়েছে সেখানে 'দর্শকের' পয়সা ওশুল হওয়ার বিষয়ও আছে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার ক্ষেত্রে তা ভিন্ন রকম। কেননা সেখানে পরিবেশনাকারী গায়েন-দোহার সাধারণত সেই সমাজেরই একজন হন। কৃষি নির্ভর প্রাত্যহিক জীবন বলে তাদের জীবন যাত্রাও সমাগত 'দর্শক'-দের প্রায় সমান্তরাল। যাত্রা এবং অন্যান্য কিছু পরিবেশনার ক্ষেত্রে গায়েন বা অভিনেতারা পেশাদার (অর্থের বিনিময়ে পরিবেশনা করেন অর্থে) হন। যাত্রার ক্ষেত্রে পেশাদার অভিনেতা লক্ষ্য করা যায় যারা প্রতি মৌসুমে কোনো দলের সাথে (কখনো কখনো একাধিক দলের সাথে) চুক্তিবদ্ধ হয়ে অভিনয় করেন। শাস্ত্রীয় মনসার গান, গাজির গান ইত্যাদির ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে যে গায়েন উক্ত লোকসমাজের একজন হলেও কখনও কখনও তিনি লোক চিকিৎসক/ওঝা বা পুরোহিতের মতো সকলের শ্রদ্ধেয় সত্তা হিসেবে সংশ্লিষ্ট গ্রামে সম্মানিত হন (মিয়া ২০১৪ ও ২০১৮, চন্দ্র ২০২০, সর্দার ১৯৯২, ফকির ২০২৪: সাক্ষাৎকার)।

দোহারেরা এক অর্থে পেশাদার, কারণ প্রতি পরিবেশনাতে তাদের 'রোজ' হিসেবে পয়সা দিতে হয়। অনেকটা দিনমজুরের মতো। যাত্রার অভিনেতাই হউন বা কৃত্যমূলক পরিবেশনার গায়েন, তারা সাধারণত গ্রামীণ লোকসমাজের প্রতিনিধি বলেই পর্যবেক্ষণ করা গেছে। খুব কম পরিবেশনাকারী পাওয়া যাবে যারা নাগরিক পরিবেশে বসবাস করে গ্রামীণ লোকসমাজের পরিবেশনাকারী হন। সেই অর্থে তারা গ্রামীণ প্রাত্যহিকতা তথা সামষ্টিক বিশ্বাসের অভিজ্ঞতায় নির্ভর করে তথানুগত হয়েই পরিবেশনা করেন। যেমন যুগীর গানের গায়েন আয়নাল হক এবং প্রধান সহচর আব্দুর রহমান ট্রাকের মালিক হলেও কাঁচামালের ব্যবসার সাথে জড়িত এবং তাঁরা গ্রামেই বসবাস করেন। গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিকতা তাদের উচ্চারণ ও চলন-বলনে বোঝা যায়। গ্রামীণ মানুষের সাপেক্ষে তাদের আলাদা মনে হয়না। মনে হয় একই সমাজের মানুষ, একই অভিজ্ঞতায় স্নাত, একই পরিবেশ-প্রতিবেশের অংশ হিসেবে প্রতিবেশী। কাঁচখেলা উৎসবে বিভিন্ন পেশার লোকজনের সমাবেশ দেখা গেছে বলে পূর্বেই উল্লেখ করা গেছে। সেখানে পরিবেশাকারীগণও বেশিরভাগই সংশ্লিষ্ট গ্রামের অধিবাসী এবং অপেশাদার। আবার গ্রামীণ পরিবেশনার কেউ কেউ পেশাদার হলেও অর্থনৈতিক শ্রেণি এবং সামষ্টিক বোধ-বিশ্বাসের দিক থেকে তারা লোকসমাজের অপেশাদার পরিবেশনাকারীর সমান্তরাল মানসিকতায় অবস্থান করেন বলে তাদের কথাবার্তায় মনে হয়েছে (শ্রীদাম, ২০২৪: সাক্ষাৎকার)। যাত্রা পরিবেশনা সাধারণত গ্রামীণ মেলা বা উৎসব উপলক্ষ্যে হওয়ার ঐতিহ্য থাকলেও কখনও কখনও যাত্রা উৎসবই গ্রামীণ বিনোদনের একটি অনুষ্ঠান-উপলক্ষ্য হতে দেখা যায়। সেখানে সংশ্লিষ্ট গ্রামের অধিবাসী ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ সমবেত হয়ে টিকিটের বিনিময়ে (কখনও কখনও স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকের ইচ্ছা ও আয়োজন সাপেক্ষে টিকিট ছাড়া) পরিবেশনা উপভোগ করে। বিকাশমান পুঁজিবাদী পৃথিবীতে যাত্রার বিবর্তনের একটি পর্যায়ে এসে দর্শনীর বিনিময়ে যাত্রার পরিবেশনা শুরু হয় যা খুব বেশিদিনের কথা নয়। ষোড়শ শতক বা তার আগে যাত্রার আদি পর্যায় হিসেবে কথিত হলেও উনিশ শতকে এসে নতুন রূপে তা আবির্ভূত হয়ে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। পেশাদার দলগুলো 'যাত্রাওয়ালা' নামে অভিহিত হওয়া থেকে বোঝা যায় এই পরিবেশনাটি বিনোদন পণ্য হিসেবে বিবর্তিত হতে থাকে এই উনিশ শতক থেকেই। শ্রীদাম সুবল এর দলসহ আরো কোনো কোনো দল এই সময় কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি পালার পরিবেশনা করে পেশাদারী অভিনেতার দল হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতো। যাত্রার জনপ্রিয়তার প্রভাবে তখন, " [..] মনসার ভাসান যাত্রা, রামযাত্রা, চৈতন্য যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের যাত্রাগান প্রচলিত হয়"(ভট্টাচার্য, ২০১৮: ২০)। সে পরিবেশনাগুলোতে সমাগত 'দর্শক' কিন্তু সবসময় বিনিময়মূল্যের দ্বারা টিকিট ক্রয় করে পরিবেশনা দেখতে আসতেন না। এখনকার যুগেও ভাসান যাত্রা, গাজির যাত্রা প্রভৃতি পরিবেশনায় টিকিটের বিনিময়ে লোকে পরিবেশনা দেখতে আসেনা। আসে খোলা উঠোন বা চত্বরে সামষ্টিকতার অবাধ ও অণিবার্য আহ্বানে। সমান্তরাল প্রাত্যহিকতা, বিশ্বাস ও একই সমাজে বসবাস করেন বলে দর্শক সেখানে পরিবেশনাকারীর অতি পরিচিত, ঘরের ও মনের খবর জানেন এমন পারিচিত। অন্য গ্রাম থেকে আসা পেশাদার দল হলেও মনে হয় তারা একই অর্থনৈতিক শ্রেণি ও মানসিকতার বলে আপনজন। তাই অনেকটা আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক তাদের তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। বর্তমান নগরকেন্দ্রিক থিয়েটারে সমাগত দর্শকের সাথে সে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ কম। কাজেই বলা যায়, গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার ক্ষেত্রে পরিবেশনাকারী পেশাদার বা অপেশাদার যাই হউন না কেন, নাগরিক টিকিটধারী দর্শকের সাপেক্ষে সেখানে উপস্থিত লোকসকল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাদেরকে 'দর্শক' নাম দিয়ে সাধারণভাবে বিবেচনা করলে গ্রামীণ পরিবেশনার লোকসকলের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়না। দর্শন করছে অর্থে 'দর্শক' হলেও গবেষক এদেরকে 'সামাজিকগণ' হিসেবে সনাক্ত করেন এই কারণে যে, সমাজে অনুসৃত সামষ্টিক বিশ্বাস (লোকবিশ্বাস) ও কর্তব্যবোধ এই অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বতস্ফূর্ত ও অণিবার্য অনুঘটক হিসেবে কার্যকর হয়। এই অনুঘটকগুলোই সমাগত লোকসমষ্টিকে ভিন্ন চরিত্র দেয় যা টিকিটধারী দর্শক থেকে আলাদা। সমাজবোধ সেখানে কার্যকর বলেই 'সামাজিকগণ' অভিধাটি পরিবেশনাগুলোর মেজাজ ও স্বকীয়তার কাছাকাছি বলে প্রতিভাত হয়। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় 'দর্শক' বলতে তাই উপরোক্ত 'সামাজিকগণের' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহকে পরিবেশনার বিশ্লেষণ পর্যায়ে বিবেচনা করা গেছে।

পরিবেশনা পর্যায়ে দর্শক-পরিবেশনাকারী সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ:

উপরোক্ত আলোচনায় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার পরিবেশনাকারী ও দর্শক-সামাজিকগণের আর্থসামাজিক অবস্থান ও মানস-প্রকৃতি সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করা গেছে। এ পর্যায়ে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকসকলের দ্বারা কৃত পরিবেশনাসমূহ পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে পরিবেশনা পর্যায়ে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি অন্বেষণ করা যাক।

যুগীর গানের পরিবেশনায় দর্শক-পরিবেশনাকারী

নাটোরে ২০২১ এবং ২০২৪ সালে যুগীর গানের দুইটি পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করে দেখা যায় যে কোনো বাড়ির উঠান, চারদিকে দর্শক-সমবেত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা যে কোনো খোলা জায়গায় সাধারণত এই পরিবেশনাটি সম্পন্ন হয়। পরিবেশনাস্থলের মধ্যভাগে বাদ্যযন্ত্র সমেত দোহার দল বসে থাকেন। দোহার দলকে কেন্দ্র করে মূল গায়েন (যুগী) ও সহচর ভুট্টু তাদের আবর্তন ক্রিয়া সহযোগে পরিবেশনাটি সম্পন্ন করেন। যুগী, ভুট্টু, যুগিনী ও তার সহচর প্রধান এই চারটি ভূমিকার সকলেই পরিবেশনাস্থলের বাইরে থেকে প্রবেশ করেন বলে প্রত্যক্ষ করা গেছে। যুগী-ভুট্টুর বৃত্তাকার চলন দিয়েই পথ চলা বোঝানো হয় এবং তারা কখনো কখনো উল্টোভাবেও বৃত্তাকার চলন করে থাকেন। দোহারেরা কেন্দ্রেই অবস্থান করে যন্ত্র সংগত ও গানে ধুয়া ধরে থাকেন। গানের সাথে যুগী ও ভুট্টু নৃত্যপর হন, থেমে গিয়ে কথোপকথন বা সংলাপ বিনিময় করেন, আবার গান করেন, চলতে শুরু করেন, আবার থেমে গিয়ে কথোপকথন করেন- এভাবেই পরিবেশনাটি সম্পন্ন হন। দর্শক পরিবেশনাস্থলের চতুর্দিক ঘিরে বসে বা দাঁড়িয়ে পরিবেশনা উপভোগ করেন।

বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বা কনসার্টসহ পরিবেশনা শুরু হয়। কসনার্টের সুরের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় লোক গান বা কখনও কখনও চলচ্চিত্রের লোকপ্রিয় সুর ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ২০২৪ সালের ৩০ জানুয়ারির পরিবেশনার শুরুতে "মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে" -এই লোকপ্রিয় গানটির সুর বাজিয়ে পরিবেশনা শুরু হয়েছিলো। অর্কেস্ট্রার পর যুগী মশাল হাতে প্রবেশ করে বন্দনা পরিবেশন করেন (গায়েনের খাতা থেকে খানিকটা হুবুহু দেয়া হলো। বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ শব্দ গবেষককৃত) :

প্রণাম মা স্বরেক সতী (স্বরস্বতী) এসো আমার আসরে ।
গান বান ছোকারা মাগো সকলী (সকলি) তোমার হাতে।।
ঢলুক (ঢোলক) তবলা জুড়ি বেহলা (বেহালা) মাগো।।
প্রথমে বন্দনা করি মা আল্লাজির চরণ
তোমারি চরণে আমার হাজার
পূবেতে বান্দিয়া নইলাম (লইলাম) পূবে উদয় বানু (ভানু)
একদিকে উদায় (উদয়?) ভানু চৌদিকে আলৌ (আলো)
উত্তরে বান্দিয়া লইলাম হিমালয় পর্বত,
সেইখানেতে হিমাল পলদা ক্যাপায় থরে থরে থরে।
[..]

বন্দনার পর মশাল হাতে মূল গায়েন যুগী হিসেবে পরিবেশনাস্থলে প্রবেশ করেন। ২০২১ এবং ২০২৪ সালের দুটি পরিবেশনাতেই বিষয়টি সাধারণীকৃত হতে দেখা যায়। যুগীর হাতে মশাল কেন এ বিষয়ে গায়েনদের জিজ্ঞেস করা হলে আয়নাল হক জানান যে, যুগী যেহেতু বহু পথ পাড়ি দিয়ে গয়া-কাশী-বৃন্দাবন যাবে, সেহেতু পথঘাটের বিপদ আপদ ইত্যাদির প্রয়োজনে হাতে মশাল রাখা হয়। তবে গবেষকের ধারণা এর প্রতীকি অর্থ রয়েছে। যুগী যেহেতু ভুট্টুর প্রশ্নের উত্তরে নানা ধরণের ব্যাখ্যা তথা জ্ঞানের কথা বলেন, সেহেতু মশালের আলোকে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে যুগীর গানের উদ্ভবকালের কোনো ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে। একইভাবে আরেকটি বিষয় দেখা যায় যে, ভুট্টু ভূমিকাতে

অবতীর্ণ অভিনেতার বাম হাতটি খানিকটা ভাজ করা, অনেকটার পক্ষাঘাতগ্রস্তদের মতো। দুটো প্রদর্শনীতেই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গেছে। এরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ২০২১ সালের পরিবেশনাতে মো. বেলাল গায়েন গেরুয়া রঙের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে একই রঙের ধূতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও উত্তরীয়সমেত প্রবেশ করেন। ২০২৪ সালের পরিবেশনাতে সেখানে মো. আয়নাল হক লাল রঙের পাঞ্জাবি, লাল ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং কালচে রঙের উত্তরীয় গলার দুপাশ দিয়ে ঝুলিয়ে পরিধান করেন। গায়েনদের মুখমণ্ডলে তিলক অঙ্কিত থাকতে দেখা গেছে উভয় পরিবেশনাতেই। পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে মনে হয় যে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের চরিত্রানুগ বেশভূষা নয়, বরং যুগী এক বিশেষ সত্তা হিসেবে সেখানে আবির্ভূত। ভুট্টু চরিত্রটি (২০২৪ সালের পরিবেশনাতে) হাঁটুর উপর পর্যন্ত লাল এক টুকরো কাপড় অনেকটা লুঙ্গির মতো করে পরিধান করেন। উপরে মলিন সাদা গেঞ্জি। মাথায় লাল কাপড় বিশেষায়িতভাবে মোড়ানো। মুখমন্ডলে সাদা রঙ মেখে লোক রূপসজ্জা গ্রহণ করেন তিনি। ২০২১ সালের পরিবেশনাতে ভুট্টু চরিত্রের অভিনেতাকে সাদা ধূতি নেংটির মতো পড়তে দেখা যায়। শরীরের উপরের অংশে প্রাত্যহিক হাফহাতা গেঞ্জি। তার মাথাতেও গামছা উপরে উল্লেখিতরূপে বিশেষায়িতভাবে প্যাঁচানো। পায়ে সাদা রঙের বৃত্তাকার নক্সা অঙ্কিত যা রূপসজ্জা। উভয় ক্ষেত্রেই ভুট্টুকে দেখে মনে হয় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। দুইজন গায়েনের দুইরকম পোষাক থেকে এমনও বলা যায় যে এই সাজ যুগী চরিত্রের নয়, বরং বয়ান পরিবেশনাকারী গায়েনের। ভুট্টু চরিত্রের সাজের ক্ষেত্রেও মনে হয় চরিত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে চিন্তা তার চেয়ে চরিত্রটির একটি আদল তৈরির চেষ্টা পোষাক ও রূপসজ্জায়। রূপসজ্জা ও পোষাক সমেত যুগী ও ভুট্টু পরিবেশনাস্থলে আবির্ভূত হয়ে আবর্তিত চলনসহ গান এবং কথোপকথনের মাধ্যমেই পরিবেশনাটি সম্পন্ন করেন। জাগতিক সৃষ্টি বিষয়ক অনেক কিছু নিয়ে ভুট্টু প্রশ্ন করে এবং যুগী উত্তর দেওয়ার সময় নানা ব্যাখ্যা-বয়ান করেন গীত ও কথা সহযোগে। দোহারেরা গানের সাথে ধুয়া ধরেন। মোটামুটি এই হলো পরিবেশনারীতি। তবে লক্ষ করা গেছে যে, ইউরোপিয় চরিত্রাভিনয়রীতিতে অনুসৃত ক্যারেক্টারাইজেশন, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক নানা মাত্রা উন্মোচন ইত্যাদিসহ এই পরিবেশনায় পরিবেশনাকারীরা সম্পূর্ণভাবে চরিত্রে রূপান্তরিত হননা, বরং বেশভূষাসহ চরিত্রের একটি আদল তৈরি করে কোনো বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা, ব্যাখ্যা, কথোপকথন এবং গীতমূলক বয়ান পরিবেশন করেন পরিবেশনাকারীগণ। বলা যায়, এ পরিবেশনা ইউরোপিয় রীতির বাস্তববাদী ধারার নাট্যচর্চার মতো চরিত্র ও ঘটনার বিশ্বস্ত অনুকরণ নয়, বরং লোকভাবনার সহজ আনন্দে রঞ্জিত এক ধরনের এক্সট্রা ডেইলি পর্যায়ের উদ্ভাস তৈরি হয়। আসরের পরিবেশে পরিবেশনাকারীরা নানা রসে জীবনের এক আধ্যাত্মিক বা দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবেন বলে তাদের উচ্চকিত সাজ ও নানা ধরণের অভিব্যক্তি। সমবেত দর্শক-সামাজিকগণ সেখানে জীবনের সেই ব্যাখ্যা শ্রবণের মাধ্যমে তাদের 'কালেকটিভ আনকনশাসে' থাকা সামষ্টিক জীবনবোধকে যাচাই করে নেওয়ার অবকাশ পান। তাই কাহিনির বিশ্বস্ত দৃশ্যায়নের চেয়ে গায়েন কেমন করে বা কতো সুন্দরভাবে সেই ব্যাখ্যা করে দর্শকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তা দেখতে, শুনতে ও সাক্ষী হতে আসরস্থলে লোকসকল জড়ো হন বলে আপাতভাবে মনে হয় । যেমন, যুগীর গান পরিবেশনায় কোনো এক সময় ভুট্টুর প্রশ্নের উত্তরে গায়েন-যুগী মানুষের জন্মের বৃত্তান্ত দেহতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেন গীত সহযোগে:

গান (হক, ২০২৪; খাতা থেকে)

আরে ও প্রাণ বাঁচা রে আমার
হায় বাছা
যখনি তোমার জননীর ঋতুকাল হলো
সকল কাজ দূরে রেখে মা কুটিরে পৌছিলো
বাপে দিলো ধনকোড়ি মা পঞ্চল পেতে নিল
একরোথি বিদ ঝুমায়ে সুদুরে পড়িল
যখনি পড়িল বিজু মায়ের ও উদরে [..]

উপরে উল্লেখিত গানটির মতো আরো অনেকগুলো গান রয়েছে এই পরিবেশনায় যা সৃষ্টি রহস্য, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি প্রসঙ্গে গায়েনের ব্যাখ্যার জন্য পরিবেশিত হয়। গায়েন আয়নাল হক এ প্রসঙ্গে বলেন, "মূলত ফ্যাক্টটা হলো-একটা দেহতত্ত্বার্থক। মানুষকে সৃষ্টি থেকে- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই আমাদের গানটা। এর বাইরে আমরা কোনো কথা বলিনা (হক, ২০২৪: সাক্ষাৎকার)।" আবার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত নিম্নোক্ত গানটি (হক, ২০২৪: খাতা থেকে) দৃষ্টি আকর্ষণ করে:

আরে ও মালা
তুলসি কোনখানে জন্মিলরে মালা তুলসি
পথ মে জন্মিল মালা মহাদেবের জটে
জটঝারিতে পড়ে গেল তুলসিরো বীচি
জল আনিতে গিয়াছিল রাধা ঠাকুর রাণী
পাইয়া তুলসির বীচি রামের হস্তে দিল
রাম লাগায় তুলসির বীচি রক্ষণ শেষে পাণি
উঠিল তুলসির গাছে চিরল চিরল পাতা
রাম বসে গাথে মালা
সীতা বসে গাথে রে মালা
তুলসি কোনখানে জন্মিলরে মালা তুলসি
এই পর্যন্ত মালার জন্য এই দুনিয়ায় মালা তুলসি
কোনখানে জন্মিলরে মালা তুলসি

এ ধরনের গানের মধ্যে যে কথাগুলো বলা হয় তা লোকপুরাণ, লোককথা, কিসসা তথা আবহমান কাল থেকে বয়ে আসা লোকসমাজের সামষ্টিক বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বা অনুবর্তী। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এতে যুক্ততা অনুভবের মাধ্যমে গায়েনের ব্যাখ্যা, গান ইত্যাদিতে একাত্ম হয়ে এক ধরনের ভক্তিভাবে সিক্ত হয় বলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। গায়েনের ভাষায়,

> আমি যেটা বলি সেটাতেই দর্শক পাগল হয়ে যায়। আমরা প্রথম জীবনে গানই গাইছি হিন্দুর বাড়িতে। হিন্দু মুসলমানের উভয়ের বাড়িতেই হয়। দরকার হইলো..শুনতে চাইলো...[..] মানুষ কোনটা বুঝে চললে একটু ভাল হয়, এই বিষয়গুলা মানুষকে এই গানের মাধ্যমে অনেকটাই অবগত করার চেষ্টা করি। [..] এক বাক্যে আমাদের এই গানের....কি বলব স্যার, মসজিদের মোয়াজ্জিন আমার গানের ভক্ত। আমার এমন শিস্য আছে স্যার যে এখানে আযান দিলে নামায হয় সেই আমার গানের আসরে সামনে বসে থাকে চেয়ারের পরে। এমন রেকর্ড ও আছে, কত হাজি হজ্জ করে আসছেন সে আমার গানের সামনে বসে থাকে। কারণ আমি নিজেকে নিজে চিনি, প্রকৃত মানুষ হতে পারিনি তার লেগাই আমি মানুষ। (হক, ২০২৪: সাক্ষাৎকার)

পরিবেশনা প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতা এবং গায়েনের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বলা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক যে ধর্মের অনুসারীই হউন না কেন বাংলাদেশের লোকসমাজে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ লোকবিশ্বাসজনিত এক বিশেষ ও উদার জীবনবোধের নীতিতে চলে। সেই মূল্যবাধ-জীবনবোধ থেকে জীবন ও সৃষ্টির ব্যাখ্যাত্মক বয়ান তারা হিতোপদেশের সুধা অর্থেই পান করে যুগীর গানের পরিবেশনায়। গাজির গান, মনসার গান ইত্যাদি কৃত্যমূলক পরিবেশনাতেও গবেষক বিষয়টি লক্ষ করেছেন। যুগীর গান কৃত্যমূলক পরিবেশনা না হলেও পরিবেশনার উপরে উল্লেখিত প্রবণতা থেকে বলা যায় যে বিনোদনের পাশাপাশি তা লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি জরুরি ভূমিকা পালন করছে। তাই সাধারণ মানুষ বয়স, পেশা, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সেখানে উপস্থিত হয়ে সামষ্টিকভাবে তাদের জীবনবোধের উদযাপন করেন সেখানে। তাই দর্শকের সাথে পরিবেশনাকারীর এক আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় পরিবেশনাকালে।

প্রাসঙ্গিকভাবে সংশয় জাগতে পারে যে গায়েনের এই ব্যাখ্যা বা বয়ানকে দর্শক-সামাজিকগণ ভক্তি সহকারে গ্রহণ করবে কেন? এর কয়েকটি উত্তর হতে পারে। প্রথমত, গায়েনের ব্যাখ্যাগুলো লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস এবং বংশ পরম্পরায় প্রাত্যহিক জীবনের চর্চা ও চর্যার অনুবর্তী বলে মনে করা যায়। 'Collective Unconscious'-এর ধারণামতে (Jung , 1981: 3) পূর্বপূরুষের চর্চিত বিশ্বাস, রুচি ও মূল্যবোধ অতিক্রান্ত একটি 'universal' চেতনা (জনপদ ও ভূগোল নিরপেক্ষ হিসেবে অনুধাবিত) প্রতিটি মানুষ তার দ্বিতীয় pshyche-তে অবচেতনভাবে হলেও বহন করে। এ ক্ষেত্রে ইয়ুং এর মতবাদের ভূগোল ও জনপদ নিরপেক্ষতা বিষয়ক কেস স্টাডিকে পুরোপুরি মেনে নেওয়াটাও সংশয়ের উদ্রেক করে বৈকি। আধুনিক গবেষণায় পরিবেশ ও আরো কিছু বহিস্থঃ অনুঘটককে নির্দেশ করেছেন কোনো কোনো গবেষক (Hunt-Meeks, 1983: 194-195 ও 200 অনুসারে)। Swanee Hunt-Meek প্রমূখের গবেষণায় বিষয়টি সংশয়সহ উল্লেখিত হয়েছে। তাঁদের মতে সমাজে বহুকাল ধরে অনুসৃত সংস্কৃতি ও বহিঃস্থ উপাদানের প্রভাব মানুষের ব্যক্তিক pshyche-তে এমন শক্তিশালী ভূমিকা রাখে যা ইয়ুং তাঁর ব্যাখ্যার পরিসরে স্পষ্টভাবে আলোচনা করেননি। উপরন্তু, ইয়ুং-এর বেশীরভাগ কেইস-স্টাডি মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক ভারসাম্যহীন ইউরোপিয় ব্যক্তির উপরে। সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তাদের দেখেননি বলেই মনে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর মতামতকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃত গবেষণা হিসেবে বিবেচনার বদলে মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণ হিসেবে অনুধাবন করাটাই সঙ্গত। বলা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের মানুষ নিয়ে তাঁর গবেষণা হলে ব্যক্তির উপর যুথবদ্ধ সমাজের সামষ্টিক চেতনা বা সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে অন্য আবিষ্কারের অবকাশ থাকতো বলে মনে করাটা যৌক্তিক। উপরোক্ত গবেষকদের মতো প্রায় কাছাকাছি দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় নাট্য সমালোচক অংশুমান ভৌমিকও মতামত প্রকাশ করেছেন যে, কোনো নির্দিষ্ট জনপদে যাপিত জনগোষ্ঠীর অবচেতনে 'সামূহিক নির্জ্ঞান' এর একটি স্তর রয়ে যায় (ভৌমিক, ২০১৯: ১৮৯)। গবেষকের ধারণা এইরূপ যে, যুথবদ্ধ সমাজে দৃশ্যমান অভিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে লিখিত ও পরিবেশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয় সামষ্টিক চেতনা, তা 'সামূহিক নির্জ্ঞান' (Collective Unconscious) আকারেই হউক, কিংবা সচেতনতার বিশেষ স্তর আকারেই হউক। কখনও তা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ কখনও তা বহুদিনের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি হিসেবে পরিবাহিত হয় মানুষের চেতনার বিভিন্ন স্তরে। সহজ করে বললে, সেগুলো তার প্রাত্যহিকতার চর্চা, কৃত্য, ভক্তি-অভিব্যক্তির ভঙ্গি ও জীবনচর্যার নানা স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হয়। কৃত্য, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক নানা অভিব্যক্তির মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যেমন, উপরে উল্লেখিত তুলসী বা মালার গানটি সেই ধরণের জীবনচর্যার অভিব্যক্তি যেখানে পূর্বপূরুষের বহুকাল ধরে চর্চিত সামষ্টিক বিশ্বাসের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র শাস্ত্র-নির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গ্রন্থ থেকে এই বিশ্বাস লব্ধ নয়, বরং লোকায়ত চর্চা হিসেবে তা মানুষ তার প্রাত্যহিকতা দিয়ে উপলব্ধি করে বিশ্বাস করে এসেছে বহুকাল ধরে। যেমন মানুষের জন্ম নিয়ে পরিবেশিত কয়েকটি গানের মধ্যেও ভ্রূণের জন্ম, গর্ভকালীন দশ মাসে ভ্রূণের রূপান্তর ইত্যাদি বিষয়ে লোকসমাজে প্রচলিত পূর্বপূরুষের বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

ভ্রূণ সৃষ্টির গান (হক, ২০২৪: খাতা থেকে):

বাপে দিল ধান কড়ি, মা আঁচল পেতে নিল।
এক রত্তি বিজ্জু (বীর্য) মায়ের উদ্দুরে (উদরে) পড়িল।
জখনি (যখনই) পেল বিজ্জু জননীর উদ্দুরে,
জর্দ্দার নন্ড (রঙ) ছেড়ে বিন্দু লাল রং (রঙ) ধরে।
এক দিনের হলে বিন্দু নিয়রেতে টলে।
দুইও দিনের হলে বিন্দু রক্তের সঙ্গে মিশে।
তিন দিনের হলে, বিন্দু ফেনার আকার।
চার দিনের হলে বিন্দু দেহের সজ্জর।(??)

পাঁচ দিনের হলে বিন্দু কাজলের রেখা।
ছয় দিনের হলে বিন্দু শরীরে মহড়া।
[..]
১ (এক) মাসের কালে (বিন্দু) জানে বা না জানে
দুই মাসের কালে লোকের কানে কানে ।
[..]

কোন ফুল থেকে জন্ম নিলে শুভ হয় (হক, ২০২৪: খাতা থেকে):

বৈশাখ মাসে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালো হয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে বয়সা বুদ্দি (বুদ্ধি) হয়।
জৈষ্ঠ (জৈষ্ঠ্য) মাসে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালো নয়
সেই ফুলোতে জন্ম নিলে চোরের লক্ষণ হয়।
[..]

উপরে উল্লেখিত গানগুলোর কথায় লোকসমাজের প্রাত্যহিক চিত্র থেকে শুরু করে সামষ্টিভাবে তারা যা কিছু লোকপরম্পরায় বিশ্বাস করে আসছে সেরকম বিষয়াদি সহজেই চোখে পড়ে। কৃষি-প্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের অনুসঙ্গ, প্রতীক ইত্যাদি দিয়ে যখন যাপিত জীবন ও সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তখন উপস্থিত সামাজিকগণ সহজেই তার মধ্যে নিজের জীবনের প্রতিফলন সনাক্ত করে। তাই তারা পরিবেশাটির সাথে নৈকট্য অনুভব করে, যুক্ত এবং একাত্ম হয় এই ব্যাখ্যার সাথে। পরিবেশনাটি তখন শুধু গায়েনের চেষ্টাকৃত অভিকরণ না হয়ে যুথবদ্ধ সামষ্টিক উদযাপনে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, পরিবেশনাকারী গায়েনগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট গ্রামের লোকসকলের দ্বারা সম্মানিত হন বলে জানা গেছে। বাংলাদেশে যুগীর গানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় আয়োজক-পৃষ্ঠপোষক শেখ মেহেদী ও গায়েন আয়নাল হক থেকে জানা যায়, এ ভূখণ্ডে যুগীর গান ক্রমবিকাশের এক পর্যায়ে জসীম ফকির নামে একজন গায়েন ছিলেন যিনি যুগীর গানের চর্চার পাশাপাশি লোকচিকিৎসাও করতেন। মানিকগঞ্জের গাজির গানের গায়েন চাঁন মিয়া, ফরিদপুরের নগরকান্দার ইউসুফ সর্দার, পার্বতীপুরের শুক্র গায়েন প্রমুখের সাথে প্রত্যক্ষ আলোচনাতেও গবেষক লক্ষ করেছে যে, গায়েনগণের কেউ কেউ এ ধরণের ভূমিকা নিয়ে লোকসমাজে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। ব্যাপারটি এমনভাবে দেখা চলে যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও লোকপুরাণের জ্ঞান ও গানের মাধ্যমে তার পরিবেশনাচর্চার পৌরহিত্য করেন বলে সাধারণ মানুষজন তাদেরকে প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলেই হয়তো মনে করেন। তাই, মন্দিরের পুরোহিত বা মসজিদের ইমাম না হলেও জীবনের ব্যাখ্যা বিষয়ক গায়েনদের বয়ানকে তারা মানেন। এই মান্যতার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধান নয় বরং লোকায়ত দর্শনচিন্তাই কার্যকর বলে ধারণা করা অমূলক নয়। আয়নাল হকও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক মতামত প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য গায়েন আয়নাল হকের সাথে সাক্ষাৎকারের গবেষক নির্বাচিত অংশ নিচে উল্লেখ করা গেল:

গ. : তো এই গানটা, এই যে ধরেন গয়া কাশি বৃন্দাবন যাচ্ছে বা দেহতত্ত্বের যে আলাপ-সালাপ এখানে হচ্ছে এগুলো হিন্দু শাস্ত্রমতেই বেশি হয়?

গা : মোটামুটি হিন্দু শাস্ত্র মতেই বেশি। [..] তা কেন? আপনারা মুসলমান হয়ে হিন্দু শাস্ত্রের গান কেন করেন?

গা : হিন্দু শাস্ত্রের গান গাইনা। এটা হলো গানের পালা হিসেবে হিসেবে গাই।

গ. : মুসলমানদের পালা নেই? মুসলমান চরিত্রেরওতো পালা আছে। গাজির গান াছে, জারি গান আছে।

গা : আছে, অন্যান্য গানও হয়তো মুসলমানদের। এগুলাতো আমরা গাই। [..] (মাদার পির আছে) ওটাও গাই, নছিমন গাই অনেক ধরণের গান গাই।

গ. : মানে আপনি যুগীর গানও (করেন) গান। এটাও (ঐগুলোও অর্থে) গান?

গা : হ্যা ঐটাও গাই।

গ. : আচ্ছা তাহলে আপনি যে এই কথাগুলো বলেন এখানে যুগী হিসেবে হিন্দু শাস্ত্রমতে, এ কথাগুলো তো আপনি চরিত্র হিসেবে করতেছেন বলে আপনি বলতেছেন? তা আপনি তাহলে এটা বিশ্বাস করেন না? যে উত্তরগুলো আপনি দেন ভুট্টু দাশ যখন জিজ্ঞেস করেতখনতো আপনি হিন্দুশাস্ত্রের আলোকেই এগুলোর উত্তর দেন-শাস্ত্রমতে?

গা : না সবটা হিন্দু শাস্ত্রের আলোকে না। আমাদের এই গানের ভেতরে মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মের অনেক কথা আসে। আর মূলত এই দেহতত্ত্বের কথাগুলি যাতে যায়-মানুষের দেহ-আমরা সব ধর্মের মানুষই আমরা মানুষকে নিয়েই গান গাই। মানুষের উত্তর পর্বে যা হিন্দুশাস্ত্রে কোনো কথা আসেনা-তবে আমি পিলিয়ার হিসেবে যেটুকু আমরা জানি যে যুগী একজন সন্ন্যাসী-গয়া কাশি শ্রী বৃন্দাবন হিন্দুশাস্ত্রেরই একটা পবিত্র স্থান। সেইখানে তীর্থে যাচ্ছে তার-যেমন মৃসলমান ধর্মে হজ্বে যাওয়া, হিন্দু শাস্ত্রে তীর্থে যাওয়া। এই জন্য আমার চরিত্রটার; কিন্তু আমি যে উত্তরগুলাদেব, সম্পূর্ণ দেহতত্ত্বের ভেতরে। ঐখানে যে কোনো হিন্দুর দোহাই বা হিন্দুর যেকোনো কথাবার্তা বা কোনো ধর্মেরই কোনো কথা আসেনা। [..]

গা : উনি একজন আসলে অনেক..., বড় বড় জট ছিল। তার আগে আসন দিত। মানে ফকির বলতো আর কি।

গ. : জসীম ফকির?

গা : জসীম ফকীর। উনি অনেক সময় অনেক রুগী- অনেক মানুষের অনেকভাবেই-

গ. : চিকিৎসা করতো?

গা : চিকিৎসা করতো-তো-[..] জ্বী না আমি গান ব্যতীত আর অন্য কিছু-

গ. : তো এই যে এই গানটার কথা বললেন, এটা কি জসীম ফকির উনার লেখা?

গা : না উনার লেখা না। তার মূলত জয়নগরে একটা দল ছিলো। ঐদল আমাদের এইখানে একটারথান ছিলো। থানের ওনে আবার বাৎসরিক ওরশ হতো। ঐ ওরশে গানটা শুনার পরে আমরা চিন্তা ভাবনা করলাম দেখি এই গানটা আমরা গাইতে পারি কি না।[..]

গ. : আচ্ছা, আমি কিন্তু আমার ঐ প্রশ্নটার উত্তরটা আমি পাই নাই। আপনি যে বললেন যে, আপনারা দলের সবাই মুসলমান, আপনারা যুগীর গান করতেছেন। এবং হিন্দু ধর্মের যে একটি পবিত্র স্থান গয়া-কাশি বৃন্দাবন, সেই চরিত্রে আপনি যাচ্ছেন। তাহলে আপনি এই পুরা গানটিকে অভিনয় হিসেবে করছেন নাকি? আপনি মনের ভেতরে কী এটা বিশ্বাস করেন যখন আপনি দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যাগুলো দিচ্ছেন সেটা আপনি মুসলমান হিসেবে দেখেন? নাকি মানুষ হিসেবে দেখেন?

গা : আমি ওটাকে মানুষ হিসাবে-মানুষের বিষয়ে ব্যাখ্যাটা

গ. : মানে আপনার পরিচয়টা কী? আপনি মানুষ না আপনি মুসলমান?

গা : আমি প্রথমে মানুষ তারপরে আমার ধর্ম, হয়তো ইসলাম, সেটাই আমি বিশ্বাস করি। প্রথমে আমি একজন মানুষ এটাই সত্য, তারপরে হলো আমার ধর্ম। [..] মৌলভীরা জলসা করেনা? ভালো হওয়ার জন্য করে। আমাদের এই গানের ভেতর.....

উপরে উল্লেখিত কথোপকথনে গায়েনের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত তা বাংলাদেশের আরো অনেক পরিবেশনার গায়েনদের সাথে কথাবার্তাতেও গবেষক প্রত্যক্ষ করেছেন। এগুলো থেকে গায়েনদের জীবনবোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই জীবনবোধ এবং এবং লোকসমাজের মানুষের হিতের উদ্দেশ্যে তাঁদের পরিবেশনার এই চর্চাকে বিবেচনা করেই গ্রামীণ সাধারণ মানুষ গায়েনদেরকে শ্রদ্ধা করে, বিপদে আপদে তাদের উপরে নির্ভর করে। তাই এমন একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রাজ্ঞ সত্তার বর্ণনা, গীতমূলক বা গীতহীন ব্যাখ্যা সর্বোপরি বয়ানকেও তারা নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মনে রাখা প্রয়োজন দেহতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা যুগীর গানে পাওয়া যায় তার সাথে বাংলাদেশে চর্চিত সুফীবাদ, বাউলবাদ, সহজিয়াসহ আরো কিছু লোকধর্মে অনুসৃত বিশ্বাসের পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। এই দর্শনগুলো বাংলাদেশে চর্চিত হয়ে লোকসমাজের মানুষের মধ্যে লোকায়ত দর্শন হিসেবে কার্যকর হয়। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর কঠিন বিধান অতিক্রান্ত এক উদার প্রান্তরের খবর আছে। সেই ঔদার্যের চারণ-ভূমি বাংলাদেশের গ্রামগুলো। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম অতিক্রান্ত এবং লোকপ্রবণতা-প্রতিফলিত দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাথে একাত্ম হয়ে সেই উদার জমিনে সামষ্টিক জীবনের উদ্‌যাপন করতে ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ সমবেত হন। গায়েন যখন ভুট্টুর প্রশ্নের উত্তরে সৃষ্টি রহস্য, জন্ম-মৃত্যুসহ পার্থিব জীবনের নানা প্রসঙ্গে গুঢ় ব্যাখ্যা দেন, তখন বিনোদনের পাশাপাশি তাদের লোকশিক্ষা হয়, নৈতিক মূল্যবোধের নিরিখ হয়। গায়েনের ভাষায়:

> মৌলবিরা জলসা করে না, মানুষকে কিন্তু হেদায়েত করার জন্য,ভালো হওয়ার জন্য। জলসা করে ভালো হওয়ার জন্য। আমাদের এই গানের ভিতরে যদি আমরা অনেক কথা আমরা বিশ্লেষণ করি,কতেক প্রশ্নের সাথে যেভাবেই বলি দেখেন যদি সৃষ্টির কথা অর্থাৎ জন্মের কথা, মৃত্যুর কথা কোনো মানুষ যদি সারাদিন রাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একবার যদি ভাবে এই পৃথিবীতে আমি যত বড় মাপের লোক হই কিন্তু কখন জানি থুয়ে চলে যাই। একবার যদি ভাবে তাইলে তার দ্বারা আমার মনে হয় কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না, অসৎ কাজ করতে পারবে না, অসৎ পথে চলতে পারবে না। একটা বার যদি ভাবে আমি এই আছি, এই নাই। কিন্তু মানুষ ভাবে কোনো মরণই নাই। আমরা হয়তো মরবোই না। কল্পনা যদি দেহের ভিতর করে এই দুনিয়ায় এই আছি, এই নাই তাহলে তার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হবে না। [..] এই সিম্পল কথাগুলো আমরা গানের মধ্যে অনেক ধিরে স্থিরে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সুরছন্দে বলি। এই কথা গুলা বুঝানোর জন্য একজন ব্যাখা দেওয়ার জন্য একজনসমওলানা বুঝায় একভাবে, আমরা বুঝাই গানে ছন্দে যাতে মানুষের সৎভাবে চলার দিকনির্দেশনাটা পায় (হক, ২০২৪: সাক্ষাৎকার)।

গায়েন আয়নাল হকের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মানবজীবনে পাপ-পূণ্যের ধারণা ও ব্যাখ্যা যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের শাস্ত্র অনুসারে পুরোহিত-মওলানা-মৌলভীদের দ্বারা প্রার্থনাকেন্দ্রে জীবন বিধান হিসেবে প্রচারিত হয়, তেমনি একটি উদ্দেশ্যে গায়েনগণ তাদের পরিবেশনা করেন। গায়েনের কথা অনুসারে জন্মের রহস্য বা মৃত্যু-চিন্তা মানুষের মধ্যে সৎ ভাবের বা সৎ পথে চলবার প্রেরণা তৈরি করবে এমনই সমান্তরাল উদ্দেশ্য গায়েন ও মওলানার। গাজির গান, রামায়ণ গান ইত্যাদিতেও গবেষক গায়েনদের পরিবেশনায় এমন একটি উদ্দেশ্য অনুধাবন করেছেন (মিয়া ২০১৪ ও ২০১৯, পাণ্ডে ২০২৩: সাক্ষাৎকার)। তাই এই পরিবেশনাগুলোতে দৃষ্ট ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপনাকে লোকহিতকরণ তথা মানবকল্যাণের জন্য কৃত অভিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা চলে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধি-বিধান ও তৎসম্পর্কিত ব্যাখ্যা বয়ান শোনার জন্য যেমন ধর্ম-ভীরু বা ধর্মপ্রাণ মানুষ জড়ো হয়, প্রায় একই কারণে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোতেও

সাধারণ মানুষ জড়ো হয়। একই কারণে পূর্বে উল্লেখিতভাবে গায়েনগণকেও তারা শ্রদ্ধা ও নির্ভরযোগ্য সত্তা মনে করে তদীয় পরিবেশনাতে অনুসৃত গান বা কথার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এর পেছনে সামাজিকগণের মনে পূর্বে উল্লেখিত গায়েনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থান এবং লোকচিকিৎসক হওয়ার মতো বিশেষ ক্ষমতায় বিশ্বাসও কার্যকর বলে মনে হয়। পরিবেশনাকারীর সাথে দর্শকদের এই একাত্মতা ইউরোপিয় চরিত্রাভিনয়রীতিতে উদ্ভূত মায়ার দ্বারা সৃষ্ট চরিত্রের আবেগের সাথে একাত্মতা নয়, বরং গায়েন কথিত জীবন-ব্যাখ্যা ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা বলে অনুধাবন করা সঙ্গত। এইভাবে যুগীর গানের আসরে দর্শক-পরিবেশনাকারীর সম্পর্কের এই বৈশিষ্ট্যটি পরিবেশনাটিকে একটি স্বকীয়তা দান করে বলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে।

কাঁচখেলা/মুখা কাঁচ পরিবেশনায় পরিবেশনাকারী-সামাজিকগণের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ

স্থানীয়ভাবে কাঁচখেলা, মুখা কাঁচ বা মুখাখেলা ইত্যাদি নামে অভিহিত পরিবেশনাটি মূলত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধাণত চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পরিবেশিত। মুন্সীগঞ্জে এই পরিবেশনাটি লালকাঁচ নামেও অভিহিত। স্থানীয় জনগণের সাথে সাধারণ আলোচনা থেকে জানা যায়, চৈত্র মাসের শেষ ১০ দিন এ উপলক্ষ্যে নানা ধরণের কৃত্যমূলক পরিবেশনা গ্রামজুড়েই অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাগনের গান, নৃত্য ও বাজনাসহ চাল-ডাল-পয়সাকড়ি উত্তোলন, চড়ক পূজা, কাঁচখেলা ইত্যাদি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ পর্যায়ে মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইরস্থ ঋষিপাড়া গ্রামে একদিনের ক্ষেত্রসমীক্ষণে মাগন ও কাঁচখেলার পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

কাঁচখেলা পরিবেশনাটি মূলত সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হয়। দেখা গেছে সারাদিন ধরে সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কয়েকটি দল ঢাক, কাসা, করতালসহ নানা সাজে সজ্জিত (কালী, শিব, মহিষাসুর ইত্যাদি) হয়ে বাদ্যের সংগতে নৃত্যপর হন। সেই পরিবেশনা দেখে গৃহস্থ পরিবার থেকে তাদেরকে সরবত, দুধ ইত্যাদি দিয়ে আতিথেয়তা করার পাশাপাশি চাল বা অর্থ প্রদান করা হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষণের দিন একটি দলের চালের পাত্রে ঢেড়শও দেখতে পাওয়া যায় যা কোনো এক গৃহস্থ হয়তো দান করেছেন। জানা গেছে এ দলগুলোতে যারা নাচ করেন ও বাজনা বাজান তারা স্থানীয় গ্রামের অধিবাসী, পেশাদার তেমন কেউ নেই। কখনও কখনও পেশাদার ঢাক বাদক নিয়ে আসা হয়। তবে বেশিরভাগ পরিবেশনাকারীই স্থানীয়। যেমন একটি দলের সদস্য হিসেবে প্রসেনজিৎ দাসের সাথে কথা বলে জানা যায় তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন এবং স্থানীয় ব্যবসার সাথে জড়িত। উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি শিবের সাজ নিয়েছেন, বিভিন্ন বাদ্যও বাজান। তার কাছ থেকেই জানা যায় যে, পরিবেশনাকারীদের বেশিরভাগই সে গ্রামের অধিবাসী। বাড়ি বাড়ি মাগন শেষে সন্ধ্যা বেলায় মাগনের চাল, ডাল, সজিসহ খিচুড়ি রান্না করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট বাড়িতে গ্রামের সকলেই প্রসাদ হিসেবে তা আহার করেন। সেই নির্দিষ্ট বাড়ির উঠানে সামাজিকগণ এবং পরিবেশনাকারীরা সমবেতভাবে আহার শেষ করলে রাত ৯-১০টার দিকে সাধারণত কাঁচখেলার পরিবেশনা শুরু হয়।

পরিবেশনা শুরুর আগে থেকেই পরিবেশনাস্থলের চারদিক ঘিরে গ্রামবাসী মাদুরের উপর আসন গ্রহণ করে অপেক্ষা করতে থাকে। কেউ কেউ পরিবেশনাস্থলে ধূপ ধুনো দিয়ে স্থানটিতে পবিত্রতার আবহ আনয়ন করেন। ঢাকের বাদ্য চলতে থাকে। গ্রামবাসীদের অনেকেই এসে ঢাকীদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে বা কাউকে মন্ডপ সেজদা করতেও দেখা যায়। এক সময় দেখা যায় পরিবেশনাকারীদের মধ্যে একজন ধুপদানির পেছনে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে স্থির দৃষ্টিতে ধুপদানির দিকে তাঁকিয়ে থাকেন। প্রসেনজিতের ভাষ্যমতে, প্রতিবছরই একজন 'সাহসী' ও বিশ্বাসী গ্রামবাসী এই ভূমিকাটি গ্রহণ করেন। এই লোকটির উপরে দেবী কালী ভর করবেন এবং খেলাশেষে তিনিই কালী হিসেবে মঞ্চে আবির্ভূত হবেন। এ সময় মূল গায়েনের মতো একজন পরিবেশনাকারী শিবের স্তোত্র পাঠ করেন। যারা স্তোত্র পাঠ করেন তাদেরকে মাখুমা বলা হয় বলে জানা গেছে। এরা এই অনুষ্ঠানে পুরোহিতের মতো দায়িত্ব পালন করেন। একসময় উপবিষ্ট পরিবেশনাকারীর শরীর ঝাঁকি দিয়ে ওঠে এবং তিনি ধুপদানি নিয়ে নাচতে শুরু করেন। অনেকটা 'ট্রান্স'-এর মতো তার এই

শারীরিক অভিব্যক্তি। সবাই তার এই উন্মত্ততা থামানোর চেষ্টা করে। একসময় খানিকটা জোড় করেই তাকে মঞ্চ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকের বাদ্য চলতে থাকে।

পরিবেশনাস্থলের এক পাশে লাল কাপড় পরিহিত পরিবেশনাকারীরা সারিবদ্ধভাবে উপবেশন করেন। এদেরকে সন্ন্যাসী বলে ডাকা হয়। লাল লুঙ্গি, কখনও ধূতির মতো করে পরিহিত, কেউ কেউ খালি গা, কেউ কেউ লাল এক টুকরো কাপড় উত্তরীয়ের মতো করে পরিধান করা, কারো কারো মাথায় লাল কাপড়। পরিবেশনাকারীদের জিজ্ঞেস করলে বলা হয় লাল রঙই সন্ন্যাসীর সাজ। এই রঙের গূঢ় অর্থ জানা যায়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে উঠে এসে তারা ঢাকী বা করতাল বাদক পরিবর্তন করার রীতিতে পরিবেশনা চালিয়ে যান। চরিত্রের সাজে সজ্জিত পরিবেশনাকারীরা বাইরে থেকে প্রবেশ করেন। বাদ্য কখনোই থামতে দেখা যায়না।

কাঁচখেলা উৎসবের পরিবেশনাটি মূলত লোকপুরাণ ও রামায়ণের নানা অংশের নাট্যমূলক দৃশ্যায়ন। এর অনেকগুলো পর্ব আছে বলে শ্রীদাম নামক অভিজ্ঞ একজন পরিবেশনাকারী জানান। তাঁর কথা অনুসারে পর্ব বা অংশগুলো নিম্নরূপঃ

১) শিব-গৌরী নৃত্য, ২) কানাই-বলাই, ৩) রাধা-কৃষ্ণ, ৪) অসুর-মহাদেব, ৫) দূর্গার দুই হস্তে নৃত্য, ৬) দশ হস্তে দূর্গার নৃত্য ও অসুরের পরাজয়, ৭) কালীকাঁচঃ কালীর ডাকিনী যোগিনী সমেত নৃত্য, ৮) পূজা

কাঁচখেলার পরিবেশনায় কার্যত উপরোক্ত এই ক্রম সবসময় মেনে নেওয়া হয়না বলেই প্রতিভাত হয়েছে । ১২ এপ্রিলের পরিবেশনায় লক্ষ্য করা যায় উপরোক্ত অংশগুলোর আগে গরু ব্যাপারীর কমিক অংশ, ধান উৎপাদনের নানা পর্যায় হনুমানের আম্রকাননের দৃশ্য ইত্যাদি পরিবেশিত বা দৃশ্যায়িত হয়। কালীর ভরগ্রস্থ পরিবেশনাকারী মঞ্চ থেকে চলে যাওয়ার পর হাতে লাঠি নিয়ে গরু ক্রেতা হিসেবে শ্রীদাম নিজেই প্রবেশ করে অপর একজন ব্যাপারী চরিত্রের পরিবেশনাকারীর সাথে মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় ইম্প্রোভাইজেশনমূলক দৃশ্যের অবতারণা করেন। সে দৃশ্যে স্থানীয় শিশুরা গরু সেজে মঞ্চ পরিভ্রমণ করে। সামাজিকগণ এই দৃশ্যের দ্বারা আমোদিত হন বলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। জোয়াল, লাঙ্গল, রাখালের লাঠি ইত্যাদি প্রপসের ব্যবহারও লক্ষ করা গেছে যেগুলো এই পরিবেশনার জন্য নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায়। এরপর ভূমিকর্ষণ থেকে ধান কাটা পর্যন্ত পর্যায়গুলো তালে তালে নৃত্যমূলকভাবে পরিবেশিত হয়। কৃষিজীবি বাংলাদেশের উপস্থিত গ্রামবাসী তখন এই পর্যায়গুলোর সাথে নিজেদের প্রাত্যহিকতার সম্পর্ক খুঁজে পেয়ে পরিবেশনার সাথে একাত্ম হয়। এমনকি পরিবেশনার নানা খুঁটিনাটিতে তারা মন্তব্য করে পরিবেশনাকারীকে সহায়তা করতেও দেখা গেছে। এই দৃশ্যের এক অংশে শস্যপূজা করতেও দেখা যায় যা গ্রামীণ কৃষি সমাজের বোধ-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত চিত্র। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চার বাইরের এই কৃত্যাচার এখানে দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য। এরপরই রামায়ণ থেকে হনুমানের একটি দৃশ্য উপস্থাপিত হয়। ফলসহ সত্যিকার আমগাছের শাখা ভেঙ্গে এনে পরিবেশনাস্থলে আম্রকানন রচনা করা হয় সহজ বিশ্বাসের ভিত্তিতে। সেই দৃশ্যটিতে ব্যবহৃত আমগুলো গ্রামবাসী অনেকেই পাবার আশা করে বলে জানা গেছে। প্রসেনিতের ভাষ্য অনুসারে, এই আমগুলো কৃত্যমূলক পরিবেশনায় ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এই আম তাদের শুভ বয়ে আনবে এমন সামষ্টিক বিশ্বাস গ্রামবাসীর। এই দৃশ্যের এক পর্যায়ে লোক অনুসঙ্গ দিয়ে তৈরি হনুমানের বিশাল লেজে সত্যি সত্যিই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় যা রামায়ণের কাহিনি থেকে নেওয়া। পরিবেশনাকারীর মুখোশ, বিশাল লেজ, আম গাছের শাখার ব্যবহার ইত্যাদি নাট্যমূলক উদ্ভাসের কারণে দর্শক সামাজিকগণ সেই দৃশ্যটির পরিবেশনায় বিনোদিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের সামষ্টিক বিশ্বাসে থাকা পৌরাণিক দেবতা বা দেবোপম চরিত্রের প্রতি লগ্ন হয় বলে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত। উল্লেখ্য, এই দৃশ্যে হনুমান চরিত্রের পরিবেশনাকারীর "রাবণরাজা হরণ করছিলা সীতারে"-এই বাক্যটি যেমন পৌরাণিক কাহিনিকে মূর্ত করে, একই সাথে "আমগাছ কই গেলো, ভূবন কাকার বাড়িতে গেলোনাতো"-সংলাপটির মধ্য দিয়ে সমকালের সাথে পৌরাণিক কাহিনির একটি সহজ যোগাযোগও তৈরি হয়। এটি

লোকনাট্যের তারল্যের বৈশিষ্ট্য যা বাংলাদেশের অন্যান্য পরিবেশনাতেও লক্ষ করা গেছে। দর্শক সমকালীন অনুসঙ্গের কারণে পরিবেশনাটির সাথে আরো বেশি যুক্ততা অনুভব করে বলে সনাক্ত করা গেছে। হনুমানের দৃশ্যের পর শিব-গৌরি-পার্বতীর নৃত্য পরিবেশিত হয়। চরিত্রানুগ লোক রূপসজ্জাসহ পরিবেশনাকারীগণ মঞ্চে আবির্ভূত হয়। শিব চরিত্রের পরিবেশনাকারী পরিবেশনাস্থলে ঢুকে উঠান ছুয়ে ভক্তি প্রদর্শন করে তাদের নৃত্য শুরু করেন। ছন্দে ছন্দে বৃত্তাকার চলনে নৃত্য পরিবেশিত হয়। ঢাকে আরতির বোল ও ঢাকীদের বৃত্তাকার চলন চলে। পরিবেশনাকারীদের নৃত্য ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে দেবতাদের অস্তিত্বকে উচ্চকিতরূপে রচনা করা হয় মঞ্চে। এই সময় কখনও কখনও দর্শকদের উলুধ্বণি দিতেও শোনা যায়। এইভাবে মূলত নৃত্য এবং কখনও কখনও ইম্প্রোভাইজেশমূলক দৃশ্য রচনার মাধ্যমে কাঁচকেলা বা মুখাকাঁচ পরিবেশনাটি সম্পন্ন হয়।

সত্যিকার অর্থে কাঁচ খেলা পরিবেশনায় দর্শক-পরিবেশনাকারীকে স্বতন্ত্র করে দেখার সুযোগ কম। কারণ, প্রথমত এই পরিবেশনাটি একটি দিন বা সপ্তাহব্যাপী সামাজিক উৎসবের অভেদ্য অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট গ্রামের প্রায় অধিকাংশের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। পরিবেশনাকারীগণ যখন মাগনের চাল তুলতে উঠানে উঠানে পরিভ্রমণ করেন, তখন সেই নৃত্যের সাথে বাদন এবং সেই বাড়ির গৃহস্থের প্রণাম-ভঙ্গি, আতিথেয়তা ইত্যাদি অভিক্রিয়াসহই যেন কৃত্য ও নাট্যের সমান্তরালে বিবেচ্য আবহটি সম্পূর্ণ হয়। উপরন্তু, ঢাকী বা শিব সেজে নৃত্যরত পরিবেশনাকারী সেই গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসী বলে যেন 'আমাদেরই ছেলে' এমন একটি আন্তরিক অভিব্যক্তি উপস্থিত গৃহস্থ বা সামাজিকগণের চোখে মুখে ফুটে ওঠে বলে প্রত্যক্ষ করা গেছে। সন্ধ্যার কাঁচখেলা পরিবেশনায় সন্ন্যাসীগণ পরিবেশনাস্থলের একপাশে বসাতে পোষাকের কারণে তাদেরকে পৃথক করা গেলেও বোঝা যায় যে তারা এই গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং এই পরিবেশনার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে বসেছে। যে উঠানে পরিবেশনা হচ্ছে সে বাড়ির কেউ কেউ পরিবেশনার মাঝখানে এসে সন্ন্যাসীদের জলযোগে সাহায্য করেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। জানা যায় প্রতি বছর এই সন্ন্যাসী পরিবেশনাকারী হিসেবে যে কোন বাড়ির ছেলেই অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইম্প্রোভাইজেশনমূলক দৃশ্যাদি রচনায় লোক অনুসঙ্গের ব্যবহার, স্থানীয় শিশুদের অংশগ্রহণ থেকে মনে হয় গ্রামবাসীরা এই দৃশ্য নির্মাণ ও সকলের সামনে প্রদর্শনকে একটি যুথবদ্ধ সমাজের পার্বণ হিসেবে বিবেচনা করছে। সেখানে কর্ষণ থেকে ধানকাটার মতো প্রাত্যহিক দৃশ্যের নৃত্যমূলক অনুকরণ দর্শক সামাজিকগণকে তাদের জীবন-জীবিকার অণিবার্য ছন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই দেখা গেছে যে, একাত্ম হয়ে সেই অনুকরণমূলক অভিকরণের নানা ত্রুটিও যেন তারা নিরিখ করে নেয়। পরিবেশনাকারী পেশাদার অভিনেতা নয় বলে তাদের চলনে কিছু ছন্দপতন হয়। সে সময় দর্শকদের মধে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াসহ চিৎকার করে পরিবেশনাকারীকে সেগুলো ঠিক করে নিতে বলে-এমন অবস্থাও লক্ষ করা গেছে। দর্শকদের এই প্রতিক্রিয়া আন্তরিক, যেন এই উৎসবের নিয়মিত অংশগ্রহণকারী হিসেবে অভিজ্ঞ সেই দর্শক আত্মীয়তার অধিকারে পরিবেশনাকারীর কাউকে কাউকে শুধরে দিচ্ছে। পরিবেশনাস্থলে ফলসমেত সত্যিকার আম গাছের শাখা আনয়ন থেকে বোঝা যায় সেই গ্রামের অন্য কোনো গৃহস্থও কৃত্য ভেবে সেখানে তার বাড়ির বৃক্ষের শাখা ভেঙে আনতে দিতে রাজি হয়েছে। পার্বণে-কৃত্যে এ তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক অবদান। আবার সেই বৃক্ষের ফলও গ্রামবাসী নারীদের কেউ কেউ পূণ্য ফল হিসেবে নেবার জন্য উন্মুখ বলে জানা গেছে। মনোবাঞ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে এই ফল ভূমিকা রাখবে বলে তাদের সামষ্টিক বিশ্বাস। তাই দৃশ্যটি হয়ে যাওয়ার পর অভিনয়স্থলে উপস্থিত পরিবেশনাকারীদের কাছে আমগুলো পাওয়ার জন্য চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো দর্শক পরিবেশনাস্থলে প্রবেশ করে নিজেই আম সংগ্রহ করেন। এইভাবে কাঁচখেলার পরিবেশনাস্থলে উপস্থিত দর্শক সামাজিকগণ নানাভাবে পরিবেশাটিকে উৎসবমুখর করে তোলেন। তাই বলা যায়, দর্শক-সামাজিকগণ সেখানে পরোক্ষভাবে নয়, বরং প্রত্যক্ষ তৎপরতায় যুক্ত হয়ে পার্বণকে সাফল্যমণ্ডিত করে। আবার পৌরাণিক দৃশ্যে পরিবেশনাকারীরা যখন শিব-পার্বতী ইত্যাদি দেবতা বা দেবোপম চরিত্র সেজে মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে নৃত্যপর ক্রিয়াদি করেন, তখন দর্শক-সামাজিকগণের উলুসহ কাউকে কাউকে প্রণামের ভঙ্গি করে ভক্তি প্রদর্শন করতেও দেখা গেছে। শিব সাজের পরিবেশনাকারী নিজে পরিবেশনাস্থলে প্রবেশ করে

নিজেই উঠানের মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করেন অভিনয়স্থল। যেন শিবোৎসবে শিব নিজেই নিজেকে প্রণাম করছে। তখন পরিবেশনাকারী, দর্শক-সামাজিক সকলে যেন এক সুতোয় দাঁড়িয়ে ভক্তি-প্লাবণের স্রোতে একাত্ম হয়ে যায়। যেন কৃত্যের পবিত্র প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় পরিবেশনাকারী-দর্শক উভয় পক্ষ। যেন পরিবেশনাকারীরা পূজার পৌরহিত্যের দায়িত্বে থেকে একাধারে নিজেও ভক্তির অভিকরণ করছেন এবং ভক্তদেরও একাত্ম করেছেন অতিলৌকিকতাকে স্মরণ করতে, অধিলৌকিক জগতের কাছে সকলে মিলে সমর্পিত হতে।

এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে কিছু পরিবেশনাকারী ও দর্শকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে উপরোক্ত বিশ্লেষণের সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীদাম দাসের ভাষ্যমতে তাদের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত বলে এই পরিবেশনা তারা পূজা হিসেবেই করেন। এক সময় শ্রীদাম দাস নিজেই ঢাক বাজাতেন, এখন তার ছেলেরা বাজান বলে তিনি জানান। অবশ্য সেদিনের পরিবেশনায় শ্রীদামকে গরু ক্রেতা হিসেবে অভিনয় প্রদর্শন করতে দেখা যায়। তিনি আরও জানান এই গ্রামের বেশিরভাগ অধিবাসী 'মোনি' (মুনি-ঋষি) গোষ্ঠীভুক্ত এবং তাদের সামষ্টিক বিশ্বাসটা সনাতন ধর্মের। তার ভাষ্য থেকেই জানা যায় যে, সমান্তরাল বিশ্বাসের কারণেই এই পরিবেশনায় দর্শক-পরিবেশনাকারী কৃত্য প্রক্রিয়ায় ভক্তি ও ভক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে একাত্ম হয়। আবার মুসলমান (রফিক আলী) দর্শকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, প্রতিবেশীর পার্বণ উপলক্ষ্যে তারা অনেক আগে থেকেই এই পরিবেশনায় উপস্থিত হন এবং তাদের "ভালোই লাগে"। ভালো লাগার কারণ হিসেবে সহজ করে জানান যে, এই পার্বণে আসলে হিন্দুরা তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) আপ্যায়নাদি করে- এইরকম কিছু কারণে তাদের ভালো লাগে (২০২৪: Questinnaire এর উত্তর অনুসারে)। মুসলমান দর্শকদের মধ্যে আরও কিছু গ্রামবাসীর প্রশ্নোত্তর থেকে জানা গেছে যে, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবাদির সময় হিন্দুরা সেখানে অংশগ্রহণ করেন এবং হিন্দুদের উৎসব পার্বণাদিতেও বহুদিন যাবৎ মুসলমানদের অবাধ অংশগ্রহণ রয়েছে। পরিবেশনার সময় গবেষকের পাশে উপবিষ্ট মুসলমান দর্শক আমজাদ (৬০) প্রতিটি দৃশ্যে যা যা ঘটবে তা গবেষককে আগে থেকেই বলে দিচ্ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে বহুদিন ধরে তিনি এই কাঁচখেলা পরিবেশনায় উপস্থিত থাকেন এবং কাহিনি ও দৃশ্য ভালোভাবেই জানেন। আরো কয়েকজন মুসলমান দর্শকের সাথে কথা বলে ব্যাপারটি নিশ্চিত করা গেছে যে এই উৎসবে তারা সবসময়ই শরিক থাকেন। কাজেই সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, মানিকগঞ্জের সিংগাইরস্থ ঋষিপাড়া গ্রাম বা তার আশেপাশের গ্রামীণ লোকসমাজে একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করে আসছে। অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে, উপলক্ষ্য যাই হউক না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুসারী হিন্দু-মুসলমান গ্রামবাসী যে কোন উপলক্ষ্যেই ধমীয় বিধান অতিক্রান্ত লোকবিশ্বাসজানত সামষ্টিকতায় আবদ্ধ হয়ে এ ধরণের পরিবেশনায় একাত্ম হন আত্মীয়তার বন্ধনে। সে আত্মীয়তা রক্তের বন্ধন কিংবা শাস্ত্রের শাসন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং একই প্রাত্যহিকতায় স্নাত বলে কৃষিজীবনের যুথবদ্ধতার শক্তিতে উদ্ভূত এক বন্ধন। একই প্রতিবেশের যত্নে লালিত বলে প্রতিবেশীর মতো তাদের আত্মীয়তা। আর এরকম কারণেই পরিবেশনায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লোকসকল 'সামাজিকগণ' হিসেবে প্রত্যক্ষ উপাদান হয়ে পরিবেশনাকে আনন্দঘন করে তোলে।

যাত্রা-র শহরস্থ পরিবেশনায় দর্শক-অভিনেতার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশের জাতীয় আঙ্গিক হিসেবে কথিত যাত্রা সাধারণত গ্রামীণ পরিবেশে কয়েকশত বৎসর যাবৎ চর্চিত হতে হতে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণার মাধ্যমে এর পরিবেশনারীতির বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি বিশ্লেষণও করেছেন বহু গবেষক। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি যাত্রার পাণ্ডুলিপি সংকলনেরও উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। পাশাপাশি সরকারী রেজিস্ট্রেশনের জন্য যাত্রা দলগুলোর পরিবেশনার মান যাচাইপূর্বক এদের পরিবেশনার মানোন্নয়নেরও উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। এমতাবস্থায় বক্ষ্যমাণ গবেষণায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য আয়োজিত যাত্রা উৎসবের দুইটি প্রদর্শনীকে প্রতিপাদ্য শহরস্থ যাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ প্রদর্শনী দুটিকে প্রতিপাদ্য হিসেবে নেওয়ার যুক্তি হিসেবে বলা যায় যে, গ্রামীণ পরিবেশে প্রদর্শিত যাত্রায় দর্শক-অভিনেতার সম্পর্কের সাপেক্ষে

শহরের প্রদর্শনীতে উক্ত সম্পর্কটির পুনরোনুধাবন। এ পর্যায়ে ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে লক্ষ্মীপুরের সুবচন যাত্রা সমাজ প্রযোজিত 'চরিত্রহীন' এবং যশোরের যশোর যাত্রা ইউনিট প্রযোজিত 'মমতাময়ী মা' নামে দুটি সামাজিক যাত্রার সাধারণীকৃত পরিবেশনারীতির পর্যবেক্ষণ প্রথমে উল্লেখ করা যাক।

পরিবেশনার শুরুতেই যথারীতি বাদ্যযন্ত্রের অর্কেস্ট্রা বাজতে দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কর্ণেড, কী-বোর্ড (সিনথেসাইজার), ঝাঁঝ, করতাল, ঢোলক, হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। উভয় পরিবেশনার কনসার্টের সঙ্গীতে রাগ নির্ভর ঐকতান এবং তাদের আরোহন-নির্ভর নাটকীয় উদ্ভাস দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য। কনসার্টের পর দেশ-বন্দনার মাধ্যমে অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করেন। সুবচন যাত্রা সমাজের বন্দনায় "প্রতিদিন তোমায় দেখে সূর্য জাগে" গানটি তিনজন অভিনেতা দ্বারা পরিবেশিত হয়। যশোর যাত্রা ইউনিটের পরিবেশিত দেশ বন্দনা ছিলো "একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়"-গানটি, যা চারজন অভিনেত্রী পরিবেশন করেন। মঞ্চের পেছনে মধ্যবর্তী স্থানে প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করে অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থান পথ তৈরী হয়। গ্রামীণ পরিবেশনায় এই পথটি যেকোন এক প্রান্তে দেখা যায়। বন্দনার পর যথারীতি যাত্রায় অনুসৃত চরিত্রাভিনয়ের উচ্চকিত সুরে কাহিনির দৃশ্যায়ন চলতে থাকে। প্রতিটি দৃশ্যের শেষে বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বেড়ে যায় এবং পরবর্তী দৃশের শুরু হলে তা কমে যায়। উপরোক্ত পরিবেশনা দুটোতে একই অভিনেতাকে দুটো প্রদর্শনীতেই অভিনয় করতে দেখা যায়। বিচারক তাপস সরকার (যাত্রাভিনেতা)-এর কাছ থেকে জানা যায় যে, উপস্থিত মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ঢাকার পরিবেশনায় এটা হতে পারে (সরকার, ২০২৪: সাক্ষাৎকার)। পরিবেশনায় উচ্চকিত ঢঙের চরিত্রাভিনয়ের পাশাপশি চরিত্রের মুখে গানও চোখে পড়ে। 'চরিত্রহীন' যাত্রার পরিবেশনায় সোমনাথ চরিত্রের অভিনেতা মাতাল অবস্থায় "আমিতো বন্ধু মাতাল নই" গানটি পরিবেশনা করেন যা বাংলা চলচ্চিত্র থেকে আহরিত। 'মমতাময়ী' মা যাত্রাতেও বাংলা চলচ্চিত্র থেকে নেয়া "এই দুনিয়া এখনতো আর সেই দুনিয়া নাই" গানটি ব্যবহৃত হয়। চলচ্চিত্র থেকে আহরিত হলেও এই গানের সংযোজনা বাংলা চলচ্চিত্রের প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করাটা সর্বতোভাবে সঠিক কিনা তা পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। কেননা আমরা জানি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সকল পরিবেশনায় গীতময়। গান সেগুলোতে অবিচ্ছেদ্য অভিব্যক্তি কৌশল হিসেবেই কাহিনির বয়ানে ব্যবহৃত। তাই গীতময়তার এই ঐতিহ্য থেকে উপরোক্ত দৃশ্যে চরিত্রের মুখে গানের সংযোজনা বিবেচনা করলেও অযৌক্তিক হয়না। কারণ সকল যাত্রাতে বিবেকের অংশগ্রহণ এবং গান গাওয়াকে প্রায় সনাক্তকারী ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বিবেচনা করা হয় এই বাংলাদেশে। তবে চলচ্চিত্র মাধ্যম থেকে আহরিত বিষয়টি বিবেচনা করলে তাকে অবশ্যই সে মাধ্যমের জনপ্রিয়তার সরাসরি প্রভাব ভাবলে অসঙ্গত হয়না। উপরন্তু, উপরোক্ত দৃশ্যগুলো চলবার সময় প্রম্পটারের প্রম্পটিং এবং বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান কখনোই থামেনা। জাতীয় সংগীতের বাদনের মাধ্যমে উভয় প্রদর্শনী সমাপ্ত করা হয় মূলত বিচারক এবং আয়োজকদের নির্দেশেই। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে তাই বলা যায়, গীতময় পরিবেশনায় এর ঐতিহ্যিক আবহের সাথে সাজুয্যপূর্ণ ও স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি কৌশল হিসেবেই বন্দনাতে গান, চরিত্রের মুখে গান, অব্যাহত বাদ্যের ঐকতান এবং জাতীয় সংগীতের বাদন দ্বারা যাত্রার পরিবেশনা সম্পন্ন হয়।

উল্লেখিত পরিবেশনা দুটোতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মূলত তিনজন বিচারক, শিল্পকলা একাডেমির কিছু কর্মকর্ত-কর্মচারী, অন্যান্য দলের কুশীলব ও গুটিকয়েক সাধারণ দর্শক। বিচারক হিসেবে শিল্পকলা একাডেমির উপ-পরিচালক আলী আহমেদ মুকুল, যাত্রাভিনেতা তাপস সরকার এবং গবেষক উপস্থিত ছিলেন। নিশ্চিতভাবেই উল্লেখিত দর্শকদের প্রকৃতি গ্রামীণ পরিসরে পরিবেশিত যাত্রার দর্শকদের চেয়ে ভিন্ন। অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা যেমন শহুরে পরিবেশে এসে জড়োসড়ো হয়ে যেতে দেখা যায়, উপরিউক্ত পরিবেশনা দুটোতেও তা লক্ষ করা গেছে। এই পরিবেশনাদুটো জড়োসড়ো হওয়ার যে কয়েকটি কারণ গবেষকের পর্যবেক্ষণে অনুভূত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক) দর্শকদের মধ্যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠি রয়েছে যা যাত্রাশিল্পীদের শ্রেণীচেতনাকে প্রভাবিত করে;

খ) বিচারক উপস্থিত থাকায় স্বতস্ফূর্ত পরিবেশনার বদলে 'যেন পরীক্ষা' এমন একটি বোধ অভিনেতাদের আড়ষ্ট করে;

গ) শহরের মঞ্চ বলে দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার অভাব পরিবেশনাকে প্রভাবিত করেছে;

ঘ) পুরো পরিবেশনার জন্য সময় বেঁধে দেওয়াকে দলগুলোর আড়ষ্টতার একটি কারণ হিসেবে বিবেচনা করা চলে;

ঙ) উপস্থিত মুহূর্তের সিদ্ধান্তে একই অভিনেতা দুটো দলে অভিনয় করায় অভিনেতাদের আন্ত-সম্পর্ক নির্মাণ ব্যাহত হয়।

লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রথমত, উপরে উল্লেখিত দর্শকগণ টিকিটধারী নন। সরকারী আয়োজনে উৎসব বলে সেখানে টিকিটের ব্যবস্থাও নেই। বরং নানা কারণে (বিশেষত শিল্পকলা একাডেমিতে ভিন্ন কাজে অর্থে) কিছু মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে যাত্রার পরিবেশনাস্থলে দর্শক হিসেবে জড়ো হয়েছেন। টিকিটের ব্যবস্থা নেই বলে উক্ত দর্শকদের যাত্রা-রসিক বা ভোক্তা হিসেবেও বিবেচনা করা চলেনা। দর্শকদের মধ্যে নাবা কিন্নরী হাসান (১৭) নামে এমন একজনকে পাওয়া যায় যিনি কখনও যাত্রা দেখেননি। শহরের পরিবেশে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তার কাছ থেকে পরিবেশনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, পরিবেশনা দেখে তার মনে হয়েছে যে সেগুলো অপর্যাপ্ত মহড়াকৃত। প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে, যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতা তার প্রথম এবং তিনি থিয়েটার দেখে অভ্যস্ত। ঢাকা শহরে থিয়েটার দেখার অভ্যস্ততা থেকে যাত্রার পরিবেশনাকে তার 'আজব' লেগেছে বলেও তিনি জানান (কিন্নরী, ২০২৪: সাক্ষাৎকার)। শহুরে মূল্যবোধ থেকে থিয়েটার দেখার আপাত অভ্যস্ততার কারণে শহরবাসী নতুন প্রজন্মের কাছে যাত্রাকে 'আজব' লাগাটা অস্বাভাবিক নয়। শুধু নতুন প্রজন্মের কাছেই নয়, সমকালীন বাংলাদেশে ইউরোপিয় ধ্যানধারণপ্রসূত প্রাত্যহিকতার চর্চা থেকে নাগরিক মানুষের অনেকের কাছেই যাত্রা বা গ্রামীণ অনেক পরিবেশনাকে আপাত অর্থে অদ্ভূত মনে হতে পারে। কারণ বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এখনো ইউরোপিয় রীতির সংলাপাত্মক বাস্তববাদী ধারার প্রযোজনা, ক্যারিকেচার কিংবা প্রযুক্তি নির্ভর বিস্ময়কর পরিবেশনাদিকে 'আধুনিক থিয়েটার' ভাবার লোক অনেক দেখা যায়। এইভাবে ঢাকার আপাত 'নাগরিক' ও 'শিক্ষিত' দর্শকের কাছে যাত্রার মতো পরিবেশনাকে শিল্পমূল্যের বিচারে তুচ্ছ মনে হওয়াটাও অস্বাভাবিক ভাবা যায়না। ঐতিহ্যবাহী নাট্যের নানা উৎসব প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতায় গবেষকের এমতও প্রতিভাত হয়েছে যে, উপরোক্ত 'শিক্ষিত' দর্শকদের মধ্যেই কেউ কেউ 'অশিক্ষিতের শিল্প' হিসেবে বিচারকের অবস্থান থেকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশাগুলো দেখেন। শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার অভ্যস্ততাবশত গবেষকের অবচেতনেও এমন ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিলোনা, নিশ্চিত করে এমন বলা যায়না। দ্বিতীয়ত, উপস্থিত দর্শকদের নাগরিক প্রাত্যহিকতার সাথে যাত্রাশিল্পীদের প্রাত্যহিক জীবনের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। দর্শকদের অনেকের শেকড় গ্রামে রয়েছে বলে হয়তো তাদের স্মৃতিতে গ্রামীণ যাত্রার অভিজ্ঞতা খানিকটা কার্যকর থাকে। তারপরও শহুরে জীবনের অভ্যস্ততা ও ঔপনিবেশিক মূল্যবোধের চর্চার কারণে তাদের অবচেতন এমন একটি পর্যায় প্রাপ্ত হয় যেখান থেকে যাত্রার পরিবেশনাকে উপভোগ করার পরিবর্তে বিচার করার পর্যায়ে তা কার্যকর থাকে বলে বোধ হয়। হয়তো সে কারণেই শহরবাসী দর্শক উপরোক্ত পরিবেশনা দুটোতে স্বতস্ফূর্ত কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নাই। আবার এমনও হতে পারে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শিল্পকলা একাডেমির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মঞ্চের আয়োজন-আবহ তাদের প্রতিক্রিয়াকে আড়ষ্ট করে দেয়।

উপরোক্ত পরিবেশনাসমূহে দর্শক পরিবেশনার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট যে বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্‌ঘাটন করা গেল তা নিম্নরূপে নির্দেশ করা চলে:

- ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাসমূহ সাধারণত কোনো উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট জনপদের মানুষ সেই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে জড়ো হন। জড়ো হওয়া লোকসকল বিনোদন-ভোক্তার মতো আকাঙ্খা নিয়ে নয়, বরং পরিবেশনার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

তাই এদেরকে 'দর্শক' হিসেবে বিবেচনা করার পরিবর্তে 'সামাজিকগণ' হিসেবে অনুধাবন করা সঙ্গত।

- বক্ষ্যমাণ গবেষণায় দেখা পরিবেশনাগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের বেশিরভাগ ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা সাধারণত গ্রামীণ পরিসরে অধিক পরিবেশিত বলে পরিবেশনাকারী ও দর্শক-সামাজিকগণ প্রায় সমান্তরাল প্রাত্যহিক জীবন যাপন করেন বলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষি সমাজে অনুসৃত জীবনানুসঙ্গ, সামষ্টিক বিশ্বাসজনিত নানা 'মটিফ' ইত্যাদি উভয়পক্ষের কাছে একইভাবে অনুধাবিত বলে যেকোনো ধর্মের অনুসারীই হউন না কেন, তারা পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। যুগীর গানের মুসলমান পরিবেশনাকারী ও সকল ধর্মের মানুষের দর্শক হিসেবে উপস্থিতি এবং কাঁচখেলা উৎসবে হিন্দু সমাজের পার্বণ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মুহুর্মহু অংশগ্রহণ এর প্রমাণ।
- যুগীর গান ও কাঁচখেলা উৎসবে দেখা দর্শকদের স্বতস্ফূর্ততার সাপেক্ষে নাগরিক পরিবেশে যাত্রার পরিবেশনা বিবেচনা করলে বলা যায় যে, যাত্রার নাগরিক পরিবেশনায় এর স্বকীয় রসের উদ্ভব ঘটেনা প্রধাণত দর্শকদের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই। পক্ষান্তরে যুগীর গান ও কাঁচখেলা উৎসবের পরিবেশনায় দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা পরিবেশনাটি প্রভাবিত হয়ে এক বিশেষ আবহ তৈরি করে যা ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশের পরিবেশনাকে এর স্বকীয়তা দান করে।
- শহরের থিয়েটার চর্চায় টিকিটধারী দর্শক সাধারণত কাহিনির নাট্যোৎকণ্ঠা, উপস্থাপনাশৈলীর বৈচিত্র্য কিংবা বিস্ময়কর কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বিনোদন পিয়াসী হন। পক্ষান্তরে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাতে টিকিটধারী দর্শকের বদলে সামাজিকগণ উপস্থিত থাকেন বলে নাট্যোৎকণ্ঠা বা উপরোক্ত বিষয়সমূহের বদলে জানা কাহিনির পরিবেশনায় জীবন ও বিশ্বাসঘনিষ্ঠ ব্যাখ্যাধর্মীতা দর্শকদের যুক্ত করে। এ বিষয়ে লোকসমাজে অনুসৃত নানা শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাসের সমান্তরলতা ও সাধারণীকৃত প্রবণতা কার্যকর যা দর্শক ও পরিবেশনাকারী উভয়পক্ষের অবচেতনকে প্রভাবিত করে।
- বাংলাদেশের লোকসমাজের প্রতিটি পরতে পরতে যেহেতু কৃত্য রয়েছে সেহেতু আপাত অর্থে কৃত্যমূলক না হলেও ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর গঠন ও কাহিনিস্থ নানা অনুঘটকের মধ্যে কৃত্যের আবহ ও অনুসঙ্গ বিরাজমান (অর্ক, ২০১৮: ২০৪ অনুসারে)। এই আবহ উপস্থিত সামাজিকগণ ও পরিবেশনাকারীকে এক সুঁতোয় যুক্ত করে। পাশাপাশি পরিবেশনাগুলোর আয়োজনে যেহেতু লোকসমাজের অবদান রয়েছে সেহেতু উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি বেশ 'সহৃদয়তার' (ঠাকুর, ২০১১: ৬৮০) সাথে সম্পন্ন হয়। জানা গল্পের পরিবেশনা তাই সামাজিকগণ বারবার দেখে। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম যে, সামাজিক আচার-কৃত্যাদি লোকসমাজের প্রাত্যহিকতায় পুনঃ পুনঃ চর্চার মাধ্যমে পূর্বপূরষের বিশ্বাসের নবায়ন যেমন তেমনি সম্পর্কের নবায়নও ঘটে দর্শকে-পরিবেশনাকারীতে। তাই সহৃদয়তার শক্তিতে এই ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলো যেন যুথবদ্ধ সমাজে অনুসৃত 'সমাজবদ্ধতার নবায়নের অভিকরণ'-এ পরিণত হয়।
- তারল্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোতে তাৎক্ষণিক বর্ণনা বা সংলাপের প্রয়োগ পরিবেশনাগুলোকে সমকালের উপযোগী করে তোলে বলে এদেরকে অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। এমনও বলা যায় যে, Cultural Transmission এর এজেন্ট হিসেবে এই পরিবেশনাগুলো জনপদের সাংস্কৃতিক বিকাশে ভূমিকা রাখে। কারণ পরিবেশনা পর্যায়েই দর্শক-পরিবেশনাকারীর স্বকীয় সম্পর্কটি অনুধাবিত হয় যা একটি যুথবদ্ধ সমাজের মধ্যে বিরাজমান বিশ্বাসের শক্তি হয়ে অতীতের সাথে সমকালকে যুক্ত করে। এই সম্পর্ক শহুরে থিয়েটারে উদ্ভূত 'এমপ্যাথি' থেকে স্বতন্ত্র বলে অনুধাবন করা গেছে।
- 'উৎসব-উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক' এই পরিবেশনাগুলোতে গায়েনের পৌরহিত্যমূলক অবস্থানকেও গবেষক সনাক্ত করেছেন তদীয় পূর্ববর্তী গবেষণার মতোই (অর্ক, ২০২১: ২৬৬ অনুসারে)। তাই ঐতিহ্যবাহী এই পরিবেশাগুলোর ক্ষেত্রে পূর্বের গবেষণায় উল্লেখিত আনুষ্ঠানিক ও সামষ্টিক

উদযাপন বিষয় দু'টো বিবেচনা করে এ ধরনের পরিবেশনার স্বকীয়তাকে এমনভাবে অনুধাবন করা গেছে যাকে নাট্যমূলক হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নাট্য অভিধা দিয়ে বিচার করা সমীচীন মনে হয়না। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে এ সংশয় এতদ্বিষয়ক গবেষণাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া বলে বিবেচনা করা চলে।

উপসংহার

উপরে নির্দেশিত প্রবণতাগুলো থেকে এমত প্রতীতি হয় যে, পরিবেশনায় 'দর্শক-পরিবেশনাকারী' সম্পর্কটি আত্মীয়ের মতো, 'অভিনেতা ও দর্শক-ভোক্তা'-র মতো নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভবত এই সম্পর্কটিকে আপাসের সম্বন্ধ (ঠাকুর, ২০১১: ৬৮০) হিসেবে নির্দেশ করেছিলেন তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে। তবে সেখানে এর সামাজিক কারণ খুব বিশ্লেষিত হয়নি, বরং নাট্য প্রক্রিয়ার রস নিষ্পত্তিতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রবণতায় সহজতার প্রতি তাঁর ইঙ্গিত ছিলো। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় এই সম্পর্কটির সামাজিক পশ্চাদপট ও লোক-প্রবণতা উন্মোচন করবার প্রয়াস পাওয়া গেছে। এ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনায় 'দর্শক' সামাজিকগণের তৎপরতায় নাট্যমূলক পরিবেশনার সক্রিয় উপাদান হয়ে ওঠে। তাই ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য পরিবেশনাকারী-দর্শকের অংশগ্রহণমূলক রসায়নের কারণে তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে একটি সামষ্টিক প্রয়াসকৃত শিল্প আঙ্গিকে পরিণত হয়। আবার একই সাথে পরিবেশনাকারী-সামাজিকগণের সম্পর্কের স্বকীয়তার কারণে একে একই সাথে 'সামাজিক পার্বণ' হিসেবে অনুধাবন করলে ভুল মনে হয়না। এমন একটি দ্বৈতাদ্বৈত উদ্ভাসই হলো বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা শিল্প।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

গ্রন্থ

অর্ক, ইউসুফ হাসান, (২০১৮) *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য পালাগান: আঙিগক বিচার ও বর্ণনাকারীর অবস্থান অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

-- --, (২০২১) "ঐতিহ্যবাহী নাট্যের কৃত্যমূলক পরিবেশনায় পরিবেশনাকারীর সাত্তিকতা ও গাহনাভিনয়", *গাহনাভিনয়*, সময় প্রকাশন

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (২০১১) 'রঙ্গমঞ্চ', *রবীন্দ্রসমগ্র* খণ্ড ৩, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, (২০১৮) *যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়*, সুপ্রকাশ, কলকাতা ৭৩

মিনেও, তাকাদা, (২০০৬) *বাংলাদেশের মুসলিম লোকমানসে ইসলাম সচেতনতা: দেশ ও ইসলাম,* আকাশি শোতেন কো. লি.,
(高田峰夫,『バングラデシュ民衆社会のムスリム意識の変動—デシュとイスラム』明石書店)

সরকার, যতীন, (২০১৬) *বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ*, চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

Jung, Carl, (1968) *The Archetypes and The Collective Unconscious*, Translated by R.F.C Hull, (Source: The Collected Works of C.G Jung), Priceton University Press, 2nd edition

প্রবন্ধ ও জার্ণাল

Jung, Carl, (1981) *The Archetypes and The Collective Unconscious*, Translated by R.F.C Hull, Priceton University Press, 3

Hunt-Meeks, Swanee, (1983) "The Anthropology of Carl Jung: Implications for Pastoral Care", *Journal of Religion and Health* , Fall, Vol. 22, No. 3 , 194-95 I 200

Available at: https://www.jstor.org/stable/27505736 (accessed 27 June 2024)

অর্ক, ইউসুফ হাসান, (২০২৩) "বাংলাদেশের কৃত্যমূলক পরিবেশনায় দর্শক-পরিবেশনাকারীর সম্পর্কের স্বকীয়তা অন্বেষণঃ একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ", *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ৬৬-৮৯

ভৌমিক, অংশুমান, (২০১৯) "নবায়ন, রূপায়ণ, সাফল্যঃ সোনাই মাধব", *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৮৯-৯০

ভৌমিক, অংশুমান, (২০১৯) "নবায়ন, রূপায়ণ, সাফল্যঃ সোনাই মাধব", *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*, ১মবর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৮৯

ফিল্ডওয়ার্ক ও সাক্ষাৎকার

- মিয়া, চাঁন, মানিকগঞ্জ, ২০১৪ ও ২০১৮,
- চন্দ্র, সুবল, রাজশাহী, ২০২০,
- সর্দার, ইউসুফ, নগরকান্দা, ফরিদপুর, ১৯৯২,
- শ্রীদাম, সিংগাইর, ২০২৪ ।
- সরকার, পলাশ পাণ্ডে, আগৈলঝাড়ার, ২০২৩
- Questinnaire মোতাবেক ব্যক্তিগত প্রশ্নপত্রের উত্তর, ২০২৪
- সরকার, তাপস, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২৪
- নাবা, কিন্নরী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২৪

A Further Observation of the Uniqness of Performer-Spectators relationship in Traditional Performances in Bangladesh.

[**Abstract :** This paper is a further observation of traditional performances in Bangladesh to pin-point the unique quality of relation between performer-spectators in it. In this phase of research, Jugir Gaan of Natore, Chaitro Shonkranti of Manikganj and urban performance of Yatra (Dhaka) has been observed. On the basis of above performances, the concept of `spectator' and `performer' has been revised with a new perspective along with a theoretical discussion of `collective unconscious' in relation to `collective belief' in folk society. After contextual study of the above performances it has been discovered that manifesting `rasa' in those performances depends on the spectators' participation for why they are different than a consumer of art. It seems better to percieve them as a `neighbour' (*shamajikgon),* rather mere spectator (*dorshok)* in theatre. As performers too live in the same society it also plays a significant role to the performance's context. Festivity dictates both performers and spectators to act in a way they are being performed. So considering the context and social trend in Bangladesh, it is better to percieve the above quality of their relation as `unique' that contributes to the artistiic manifestation of Bengali culture. It can be said that, even if these performces are theatrical they should neither be percieved as`theatre' according to Euroepan aesthetics, nor as `Natya' according to Sanskrit theories. It should be called differently for of their identitical qality of social ceremony.]